বাসস্টপে কেউ নেই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী · কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৬৮

প্রচ্ছদ—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণী কলিকাতা—৬
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ভাস্কর প্রিণ্টার্স, ৮৩বি, বিবেকা
রোড, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই কর্তৃক মুদ্রিত।

ঘুমচোখে নিজের ঘর থেকে বেরোবার মুখে পাশের ঘরের পর্দাটা সাবধানে সরিয়ে রবি তার বাবাকে দেখতে পায়। খোলা স্টেটসম্যানের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর সামনে একটা ক্ষুদে টেবিলেব ওপর এক জোড়া পা, পায়ের পাশে একটা গরম কফির কাপ। ঐ স্টেটসম্যান, পা আর কফির কাপ—ঐ তার বাবা। রবি প্যাণ্টেব পকেটে হাত ভরে রিভলভারটা বের করে আনল। সেটা তুলল, এক চোখ ছোটো করে লক্ষ্যস্থির কবল। তারপর টিপল ট্রিগার।

ঠিস্সুং···ঠিস্সুং···ঠিস্সুং···তিনটে বুলেট ছুটে গেল চোখেব নিমেষে। স্টেটসম্যানটা খসে পড়ে যায় প্রথমে, দামী স্প্রিংয়ের ওপর দুর্ধর্ষ নরম ফোম রবারের গদির ওপর চলে পড়ে যায় বাবা, গদির ওপর দুলতে থাকে শরীর। বাবা চমৎকার একটা মৃত্যু চিৎকার দেয়—আঃ আ আআ···

ববি হাসে একটু। রিভলভাবটা আবার পকেটে ভরে দু পা এগোয়, তার বাবা দেবাশিস শুয়ে থেকেই তার দিকে চেয়ে বলে--শট্! শট্!

রবির ঘুমমাখা কচি মুখে চাপা বহস্যময় হাসি। বলে—নাইস অব্ ইউ টেলিং ছাট।

দেবাশিস উঠে বসে। জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটে নেয়। স্টেটসম্যানটা দিয়ে মুখ ঢাকার আগে বলে—প্রসিড টুওয়ার্ডস্ দা বাথরুম ম্যান।

—ইয়া। বলে রবি হাই তোলে। ডাকে—দিদি।

অমনি অন্য পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে আধবুড়ি ঝি চাঁপার হাসিমুখ উঁকি দেয়—সোনা।

দুহাত বাড়িয়ে রবি ঘুমন্ত গলায় বলে—কোল।

চাঁপা তাকে কোলে নেয়। এই সকালের প্রথম বাথরুমে যাওয়াটা বড় অপছন্দ রবির। একটু সময় সে দি'দির কোলে উঠে থাকে রোজ সকালে। কাঁধে মাথা রেখে হাই তোলে।

চাঁপা কানে কানে বলে—আজ রবিবার।

—হুঁ।

—ছুটি।

—ইয়া।

—সোনাবাবু আজ কোথায় কোথায় যাবে বাবার সঙ্গে?

কচি মুখখানা একরকম সুস্বাদু হাসিতে ভরে যায় রবির। প্রকাণ্ড শার্শিওলা চওড়া জানালার কাছে এসে চাঁপা পর্দা সরিয়ে দেয়। সাততলার ওপর থেকে বিশাল কলকাতার দৃশ্য ছবির মতো জেগে ওঠে। নীচে একটা মস্ত পার্ক। পার্কের মাঝখানে পুকুর। চারধারে বাঁধানো রাস্তায় লোকজন হাটছে।

ও ঘরে টেলিফোন বাজে, রিসিভার তুলে নেওয়ার 'কিট' শব্দ হয়। তারপর দেবাশিসের স্বর—হ্যালো।

রবি বলে—ফোন।

চাঁপা বলে—হুঁ।

—কার ফোন বলো তো!

—বাবার বন্ধু কেউ।

—না, মণিমার। রবি বলে।

চাঁপার মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—এবার চলো, মুখটুখ ধুয়ে নেবে।

রবি হাই তোলে, বলে—কাল রাতের গল্পটা শেষ করোনি।

চাঁপা হাসে—বলব। দাঁত মাজতে মাজতে।

ও-ঘর থেকে দেবাশিসের হাসির শব্দ আসে। বলে—আজই!

…হুঁ হুঁ…না, না, রবিবার শুধু রবির দিন। এ দিনটা ওর সঙ্গে কাটাই।…আচ্ছা…

রবি উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বলে—ঠিক মণিমা।

—এখন চলো তো। চাঁপা বলে।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে হাই তোলে রবি। চাঁপা তার ছোট্ট ব্রাশে পেস্ট লাগাতে যাচ্ছিল, রবি রাগের স্বরে বলে—না, না, পেস্ট না।

—তবে কী দিয়ে মাজবে ?

—তোমার কালো মাজনটা দিয়ে।

—ও তো ঝাল মাজন ! পেস্ট তো মিষ্টি।

—না, পেস্ট বিচ্ছিরি। ফেনা হলে আমার বমি পায়।

—বাবা যদি টের পায় আমার মাজন দিয়ে মেজেছো তাহলে রাগ করবে কিন্তু।

—টের পাবে কি করে ! চুপ চুপ করে মেজে দাও। আঙুল দিয়ে কিন্তু। ব্রাশ বিচ্ছিরি।

চাঁপার বুড়ো মুখখানা মায়ার হাসিতে ভরে ওঠে। সে রান্নাঘর থেকে তার সস্তা কালো মাজনের শিশি নিয়ে এসে দাঁত মেজে দিতে থাকে।

রবি ভ্রু কুঁচকে বলে—গল্পটা বলবে না ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর·· কতটা যেন বলেছিলাম সোনাবাবু ?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। শিবুচরণ রাত্তির বেলা একা মাছ ধরতে গিয়েছিল নৌকোয়। জাল টেনে তুলতেই দেখে মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, লালটেমের আলোয় জাল খুলতেই মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ বেরিয়ে এল। ছোট্ট নৌকো, চার হাতখানেক হবে। তার একধারে শিবুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে লালটেম জ্বলছে, ওধারে ফণা তুলে কালকেউটে। আর খোলের মধ্যে জ্যান্ত

মাছগুলো তখনো দাপাচ্ছে। চারধারে 'কালিঢালা অন্ধকার, নিশুত নিঃঝুম। মাঝগাঙে শিবুচরণের সে কী বিপদ! নড়তে চড়তে পারে না, ভয়ে বুদ্ধিভ্রংশ, হাতে পায়ে সাড় নেই।

রবি প্রথম কুলকুচোটা সেরে নিয়েই বলে—জলে ঝাঁপ দিল না কেন?

চাঁপা একটু থতিয়ে গিয়ে বড় বড় চোখ করে চায়—ঠিক তো সোনাবাবু! কী বুদ্ধি বাবা তোমার ঐটুকুন মাথায়! উঃ।

বলে চাঁপা রবির মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নেয়। মাথাটা কাঁধে চেপে রেখে বলে—সোনাবাবুব মাথাব মধ্যে বুদ্ধিব বাসা। এমনটি আর দেখিনি।

রবি মুখ টিপে অহংকাবেব হাসি হেসে মুখ লুকিয়ে বলে—উঃ. তারপর বলো না!

—হ্যাঁ, তা শিবুচবণের হাতে পায়ে তো খিল ধবে গেছে তখন! কাঁপুনি উঠছে। ভাবছে এই মলুম, এই গেলুম, আর বাপভাই ছানাপোনার মুখগুলো দেখতে পাবো না। কালসাপে খেলে আমাকে গো! কে কোথায় আছো মানুষজন, এসে পরাণটা রাখো। কিন্তু কোথায় কে! শীতের মাঝরাতে মাঝগাঙে জনমনিষ্যি নেই। শিবুচরণ বুঝল যে মানুষজনকে ডাকা বৃথা। কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। তখন ভয়ের চোটে শিবু বামনাম করতে থাকে, কিন্তু সাপটা নড়ে না। শিবুর মনে হল, তাইতো, রামনাম তো ভূতের মন্ত্র। তখন সে মা মনসাকে ডাকতে থাকল। তাতে যেন আরো জো পেয়ে সাপটা এধার ওধার গোটা দুই ছোবল মারল। লালটেমটা মাঝখানে 'থাকাতে রক্ষে! কিন্তু সে আর কতক্ষণ। শিবু বুঝে গেল, মা মনসা কুপিত আছেন কোনো কারণে তার ওপর। ডেকে কাজ হবে না, হিতে বিপরীত হয় যদি। তখন শিবুচরণ মনে করল গাঁয়ের পুরুতমশাই বলেন বটে, বাপ পিতেমোর আত্মা··· সোনাবাবু বোসো।

চাঁপা ডাইনিং রুমে এনে চেয়ার টেবিলে বসায় রবিকে। রবি বিরক্ত হয়ে চাঁপাকে আঁকড়ে ধরে বলে—উঃ! তুমি আগে বোসো, আমি তোমার কোলে বসব।

চাঁপা চারধারে চেয়ে কানে কানে বলে—আমি কি চেয়ারে বসতে পারি? বাবা দেখলে যে রাগ করবে!

—একটুও রাগ করবে না। উঃ, বোসো। কথা শোনো না কেন?

—বসছি, বসছি। বলে চাঁপা তাকে কোলে নিয়ে বসে। প্লেটে সেঁকা রুটি মাখন, দুধের গেলাস রেখে যায় প্রীতম চাকর। রেখে সে বলে—রবিবাবু, কাল যখন সন্ধেবেলা আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন কে আমার কানে জল ঢেলে পালিয়ে গেল শুনি!

—তুই ঘুমোস কেন সন্ধেবেলা? বাবা রাগ করে না?

—ওঃ, ঘুম নয়। চোখ বুজে তোমার জন্য একটা গল্প ভাবছিলাম আর তুমি জল ঢেলে পালিয়ে গেলে। কানের মধ্যে এখনো জলটা ফচ্ ফচ্ করছে। আজ বাবাকে যদি বলে না দিই।

পকেট থেকে গম্ভীর ভাবে রিভলভারটা বের করে রবি, তুলেই ট্রিগার টেপে।

ঠিসুং···ঠিসুং···ঠিসুং···'আঃ আ আ' বলে প্রীতম টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রবি বলে—তারপর বলো।

চাঁপা অসহায় ভাবে বলে—কী যেন বলছিলাম।

—বড্ড ভুলে যাও তুমি।

—বুড়ো হচ্ছি না!

—বুড়ো হলে কি ভুলে যেতে হয়?

চাঁপা তার গালে গালটা ছুঁইয়েই সরিয়ে নেয় মুখ, বলে—বুড়ো পুরুতমশাই বলেন, বাপপিতেমোর আত্মারা সব সময়ে আমাদের নাকি চোখে চোখে রাখেন। এমনিতে কিছু করতে পারেন না,

কিন্তু প্রাণভরে ডাকলে তারা এসে আপদ বিপদের আসান করে দিয়ে যান। শিবুচরণ তখন ডাকতে থাকে—ও মোর বাপপিতেমো, তোমরা কে কোথায় আছো, ছ্যাখোসে তোমাদের আদরের শিবের দশাখানা। নিশুত রাতে কে বা জানবে শিবেকে দংশেছে নিঘিন্নে জীব, কে ডাকবে ওঝা-বদ্যি, শিবে যে যায়···এইসব বিড়বিড় করে বলছে যখন, তখনই সাপটা হঠাৎ ঠিক মানুষের গলায় বলে—ওহে শিবুচরণ···

ও-ঘর থেকে পর্দাটা সরিয়ে দরজায় দাঁড়ায় দেবাশিস। একটু ভারী গলায় বলে—ম্যান, হারি আপ, হারি আপ···

—গী···মুখ ফিরিয়ে হাসে রবি। চাঁপা জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়ায়, কোলে রবি।

দৃশ্যটা দেখে একটু হাসে দেবাশিস, পর্দাটা ফেলে দেয়। ও ঘর থেকে তার গলা পাওয়া যায়—ড্রেস আপ ম্যান ড্রেস আপ্।

—ইঁয়া! উত্তর দেয় রবি, তারপর দুটো টোস্ট দু কামড় করে খেয়ে ফেলে দিয়ে বলে—দিদি, তাড়াতাড়ি করো।

—কিছু খেলে না সোনাবাবু!

—আঃ, খেতে ইচ্ছে করছে না যে।

—দুধটুকু তবে, দু চুমুক. দাদা আমার!

—ইস্, কী যে যন্ত্রণা করো না!

বলে রবি ঢকঢক করে দুধটা খায়। হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ডাকে—দিদি তাড়াতাড়ি।

দেবাশিস ভিতরদিকের দরজা ভেজিয়ে দিল সাবধানে। রবি ও ঘরে পোশাক করছে। ঘরিতে আটটা বাজে। তৃণা এখন নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে। ও একটু দেরীতে ওঠে। ওদের বাড়ীর এখনকার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখে নিল দেবাশিস। তৃণার বর শচীন এখন বাগানে। এমন ফুল-পাগল, গাছ-উন্মাদ লোক কদাচিত দেখা যায়। কেবল মাত্র ঐ গাছের জন্য, ফুলের জন্য

হাজরা রোডের ওপর সাতকাঠার মতো জমি সোনার দাম পেয়েও বেচবে না। ঐ সাতকাঠার কোন দরকারই হয় না ওদের, বাড়ির চারধারে বিস্তর জমি। বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা, রাস্তার ওপাশে ঐ ফালতু জমিটায় তার বাগান। এতক্ষণে সেখানে গাছপালার মধ্যে জমে গেছে শচীন। তৃণার এক ছেলে, এক মেয়ে, মন্নু আর রেবা। মন্নু টেনিস শিখতে যায় রবিবারে, রেবার নাচগানের ক্লাশ থাকে। আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে তৃণার চারধারে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ বড় একটা থাকে না। অবশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে, দেবাশিস আর তৃণার মধ্যে একটা প্লাস চিহ্ন আছে। এমন কি দেবাশিসের বৌ চন্দনা আত্মহত্যা করেছিল না খুন হয়েছিল এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ কাটেনি এখনো। পুলিশ অবশ্য কেস দিয়েছিল কোর্টে খুনের দায়ে দেবাশিসকে জড়িয়ে, কিন্তু দুর্বল কেসটা টেকেনি। কিন্তু জনগণের মনে এখনো সম্ভবতঃ দেবাশিস আসামী।

ডায়াল করার পর নির্ভুল রিং-এর শব্দ হতে থাকে আর দেবাশিসের একটা দুটো হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায়। শ্বাসের কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে।

—হেল্লো। তৃণা বলে।

—দেব।

—বুঝেছি।

—কথা বলার অসুবিধে নেই তো!

—একটু আছে।

—ঘরে কেউ আছে নাকি?

—হুঁ।

—তাহলে দশ মিনিট পরে ফোন করব।

তৃণা একটু হাসে। বলে—না না, ভয় নেই, এসময়ে কেউ থাকে নাকি! একে রোববার, তার ওপর বাদলা ছেড়ে কেমন

শরতের রোদ উঠেছে। কেবল আমিই পড়ে আছি একা, কেউ নেই।

—কী করছিলে?

—টেলিফোনটা পাশে নিয়ে বসে ছিলাম, হাতে খোলা জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির; কিন্তু একটা কবিতাও পড়া হচ্ছিল না।

দেবাশিস গলাটা সাফ করে নিয়ে বলে—কী করবে আজ?

—কী আর! বসে থাকব। তুমি?

—আজকাল রবি ছুটির দিনগুলোয় চাঁপার কাছে থাকতে চায় না।

—বড় হচ্ছে তো, রক্তের টান টের পায়। শত্ত হলেও তুমি বাপ।

—তুমি বেরোচ্ছো না?

তৃণা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—জানোই তো, চারদিকে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া, একা বেরোলেই শচীন এমন একরকম কুটিল চোখে তাকায়। আজকাল বুড়োবয়সে বড্ড সাসপিসিয়াস হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও পছন্দ করে না। তাই আটকে থাকি ঘরে।

—দূর! ওটা কোন কথা হল নাকি?

—তবে কথাটা কী রকম হলে মশাইয়ের পছন্দ?

—আমি বলি, তুমিও বেরিয়ে পড়ো, আমিও বেরিয়ে পড়ি।

—তার'র?

—কোথাও মীট করব।

তৃণা একটু চুপ করে থেকে বলে—দেব, রবি কিন্তু বড় হচ্ছে।

—কী করব?

—সাবধান হওয়া ভাল। যা করো ছেলেকে সাক্ষী রেখে কোরো না।

—তিনু, তুমি কিন্তু এতটা গেরস্ত মেয়ে ছিলে না, দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছো ?

—বয়স হচ্ছে।

—ওসব আমি বুঝি না। গত সাতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—মিথ্যুক।

—কী বলছ ?

—বলছি, তুমি মিথ্যুক। তৃণা হাসে।

—কেন ?

—পরশুদিনও তুমি সন্ধের পর গাড়ি পার্ক করে রেখেছিল রাস্তায়, যেখান থেকে আমার শোয়ার ঘরের জানালা দেখা যায়।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরে দেবাশিস, শ্বাসকষ্ট। হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায় একটা ..দুটো···। গভীর একটা শ্বাস টানে সে। বুকে বাতাসের তুফান টেনে নেয়।

দেবাশিস আস্তে করে বলে—কী করে বুঝলে যে আমি !

—তোমাকে যে আমি সবচেয়ে বেশী টের পাই।

—গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেছো।

—না। শুধু আবছা গাড়িটা দেখেছি। আর দেখেছি ড্রাইভিং সীটে একটা সিগারেট আর দুটো চোখ জ্বলছে।

—যাঃ।

— আমি জানি দেব, সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

দেবাশিস দাঁত টিপে চোখ বুজে লজ্জাটাকে চেপে ধরে মনের মধ্যে। গলার স্বর কেমন অন্য মানুষের মতো হয়ে যায়. সে বলে— তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

—জানবে কী করে ! তৃণা হাসে—তোমাকে যে না চেনে সে কী করে জানবে রাস্তায় কার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে বসে আছে ড্রাইভিং সীটে একা ভুতের মতো ! আমি ছাড়া এত মাথাব্যথা আর কার ?

—তুমি অনেকক্ষণ বড় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে। পিছনে ঘবেব আলো, তাই তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যদি জানতাম যে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো।

—তাহলে কী কবতে ?

—তাহলে তক্ষুনি বাস্তায নেমে ছক্করবাজি নাচ নেচে নিতাম।

—দেব, বয়স বাড়ছে।

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ বলে—পাগলামিও।

—বুঝলাম। কিন্তু কেন ? ওবকম কাঙালেব মতো আমার বাড়ির পাশে বসে থাকবাব মতো কী আছে ? নতুন তো নয়।

দেবাশিস ঠিক উত্তবটা খুঁজে পায না। বক্ত কলবোল তোলে। বুকে আছড়ে পড়ে অন্ধ জলোচ্ছ্বাস। সে বলে—তিন্নু, আমি বড কাঙাল।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে। কিছু বলে না।

দেবাশিস বলে—শুনছো।

—কী ?

—আমি বড কাঙাল।

—কাঙাল কী না জানি না তবে বাঙাল বটে।

—তাব মানে ?

—বাঙাল মানে বোকা। বুঝেছো ?

—তাই বা কেন ?

—ববি কোথায ? তোমাব এসব পাগলামিব কথা তাব কানে যাচ্ছে না তো ?

—কানে গেলেই কী। ও বাচ্চা ছেলে, বুঝবে না।

তৃণা একটা মৃদু হাসি হেসে বলে—তুমি বাচ্চাদেব কিছু জানো না। ওরা সব আজকাল পাকা বিচ্ছু হযে যাচ্ছে। তাছাড়া বাচ্চাবা কিন্তু সব টেব পায।

দেবাশিস একটু হতাশাব গলায বলে—শোনো, ববির জন্য

চিন্তার কিছু নেই। চিন্তা করে লাভও নেই। যদি টের পায় তো পাক। আগে বলো, তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না!

তৃণা মৃদুস্বরে বলে—কোথায়?

—তুমি যেখানে বলবে।

—আমার লজ্জা করে। তোমার সঙ্গে যে তোমার ছেলে থাকবে!

—ও তোমায় চেনে না নাকি! এসব নতুন ডেভেলপমেণ্ট্ তোমার কবে থেকে হচ্ছে?

—রবি বড় হচ্ছে, তাই ভয় পাই। বুঝতে শিখছে।

—ভয় পেয়ো'না। গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি। ঘণ্টা খানেক চিড়িয়াখানা আর রেস্টুরেণ্টে কাটাবো। দুপুরে আমার বোনের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অবশ্য একা রাবরই নিমন্ত্রণ, ওদের বাড়িতে যে আমি খুব জনপ্রিয় নই তা তো জানোই, রবিকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আমি ফ্রী।

—তার মানে এগারোটা কী বারোটা হবে বেলা। আমি কী তোমার মতো স্বাধীন দেব? দুপুবে সকলের খাওয়ার সময়ে বাইরে থাকলে লোকে বলবে কী?

—তাহলে চিড়িয়াখানা বা রেস্টুরেণ্টে এসো।

—তাহলে রবির চোখ এড়ানো যাবে না।

—উঃ। তুমি যে কী গোলমাল পাকাও না।

তৃণা হেসে বলে–আচ্ছা, না হয় দুপুরের প্রোগ্রামই থাকল। কোথায় দেখা হবে?

—তুমি ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে থেকো।

দেবাশিস চোখের কোণ দিয়ে দেখে, রবি এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা সরিয়ে, দরজার চৌকাঠে। স্ট্রেচলনের একটা হাল্কা নীল রঙের প্যাণ্ট আর দুধ-সাদা একটা টি-শার্ট পরনে, বুকেব কাছে বাঁ ধারে মনোগ্রাম করা ওর নামের আদ্য অক্ষর। মাথায় থোপা থোপা চুলের ঘুরলি। একটু হাসি ছিল মুখে। সেটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন।

—তাহলে ? দেবাশিস ফোনে বলে।

—আচ্ছা, ছাড়লাম।

—সো লং।

ফোনটা রেখে দেয় সে।

হাসিটা আর রবির মুখে নেই, মিলিয়ে গেছে, চেয়ে আছে বাবার দিকে, চোখে চোখে পড়তেই মুখটা সরিয়ে নিল।

দেবাশিস ছেলেব দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঝড় থেমেছে, ঢেউ কমে এল, শুধু অবসাদ। টেনশনের পর এমনটা হয়, মুখে একটু সহজ হাসি ফুটিয়ে তোলা এখন বেশ শক্ত, টানাপোড়েন এখনো তো শেষ হয়নি। তৃণার সঙ্গে দুপুরে দেখা হবে, ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। তার স্নায়ুর ভিতরে এখনো একটা তৃষ্ণার্ত উচাটন ভাব। দেখা হবে, পিপাসা বাড়বে, তবু এক সমুদ্রের তফাৎ থেকে যাবে সারা জীবন তৃণাব সঙ্গে তার।

রবি মুখ তুলতে দেবাশিস ক্লিষ্ট একবকম হাসি হাসে। রবি কি সব বোঝে! বুকেব মধ্যে একটা ভয় আচমকা হৃদযন্ত্রকে চেপে ধরে তার।

চতুর ভঙ্গিতে দেবাশিস এক পা এগিয়ে হাত বাড়িযে বলে—দিস্ ইজ দেবাশিস দাশগুপ্ত।

বাড়ানো হাতখানা রবি ধবে, শেকহ্যাণ্ড কবতে কবতে বলে-—দিস ইজ ববীন দাশগুপ্ত, প্লীজড টু মীট ইউ।

ববির পিছনে চাঁপা দাঁড়িয়ে, পবিষ্কার শাড়ি পবেছে, চুল আঁচড়েছে, দেবাশিসের চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে ভাবী নবম সুরে বলে—বাবা, আমি কি সোনাবাবুব সঙ্গে যাবো ?

দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—কোথায় ?

চাঁপা লাজুক গলায় বলে—সোনাবাবু ছাড়ছে না, কেবল সঙ্গে যেতে বলছে।

রবি করুণ মুখভাব করে বলে—দিদি যাবে বাবা ?

দেবাশিস একটু ক্ষীণ হাসি হাসে, বলে—তোমার ইচ্ছে হলে যাবে, কিন্তু খাবে কোথায় ? ওর তো নেমন্তন্ন নেই।

চাঁপার মুখ একটা হাসির ছটায় আলো হয়ে যায়, বলে—আমি কিছু খাবো না, সকালে পান্তা খেয়ে নিয়েছি, সোনাবাবুর সঙ্গে থাকব, সেই আমার খাওয়া।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজা খুলে লিফটের দিকে এগোয়।

॥ দুই ॥

প্রেম একরকম, পাপ আর একরকম, কোনটা প্রেম, কোনটা পাপ তা বোঝা যদিও মুস্কিল, তবু কতগুলো লক্ষণ, তৃণা জেনে গেছে। মনে মনে যখন সে দেবাশিসের কথা ভাবে তখন তার শচীনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে, ছেলেমেয়ের দিকে চাইতে পারে না, আর বুকের মধ্যে একরকম তীব্র শুষ্ক বাতাস বয়, গলা শুকোয়, জিভ শুকোয়, বিনা কারণে চারিদিকে চোরচোখে তাকিয়ে দেখে। নিজের ছায়াটাকেও কেমন ভয়-ভয় করে।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোতে গিয়েই তৃণা ভারী চমকে ওঠে। কিছু না, বাইরের বেসিনে শচীন খুবই নিবিষ্টভাবে তার বাগানের মাটিমাখা হাত ধুচ্ছে। বেঁটে খাটো মানুষ, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, চোখে মুখে একটা কঠোর পুরুষালী সৌন্দর্য আছে। শচীন তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি, তবু তৃণা বাথরুমের দরজার পাল্লাটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। খোলা শরীরের ওপর কেবল শাড়িটা কোন রকমে জড়ানো। কেমন লজ্জা হল তার, তাড়াতাড়ি ডানদিকের আঁচল টেনে শরীরের উদোম অংশটুকু ঢেকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঘরে চলে এল।

ঘরটা তার একার, সম্পূর্ণ একার। একধারে মস্ত খাট, বইয়ের সেলফ খাটের নাগালের মধ্যেই, অন্যধারে ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, একটা আলমারি, সবই দামী আসবাব, মস্ত বড় বড় দুটো জানালা দিয়ে সকালের শারদীয় রোদ এসে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে, উজ্জ্বলতা প্রখর। সাধারণ শায়া ব্লাউজ পরে নিল সে, শাড়িটা ঠিক করে পরল, ওয়ার্ডরোব খুলে বাইরে বেরোনোর পোশাকী শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ বের করে পেতে রাখল বিছানায়। দূর থেকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সেগুলো, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে বসে। তার চেহারা ছিপছিপে, ফর্সা, মুখশ্রী হয়তো ভালই, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক তার মুখের সজীবতা। চোখ কথা কয়, চোখ হাসে, নাকের পাটা কেঁপে ওঠে অল্প আবেগে। ঠোঁট ভারী, গাল ভারী, সব মিলিয়ে তার বয়স সত্যিকারের তুলনায় অনেক কম দেখায়। আবার বয়সের ঢলে তার কোথাও যে কোনো খাঁকতি নেই সেটাও বোঝা যায়। নিজেকে ভালবাসে তৃণা, ভালবাসার মতো বলেই। মাঝে মাঝে সে নিজের প্রেমে পড়ে যায়।

পাশের ঘরে শচীনের সাড়া পাওয়া যায়। সুরহীন একরকম গুনগুন শব্দ করে শচীন। গান নয়, অনেকটা গানের মতো। শচীনের ঐ এক মুদ্রাদোষ। ঐ সুরহীন গুনগুন শব্দ কি ওর একাকিত্বের?

যদি তাই হয়, তবু ঐ একাকিত্বের জন্য তৃণা দায়ী নয়। দেবাশিসও নয়। একদা শচীনই ছিল তৃণার সর্বস্ব। কিন্তু শচীনের কে ছিল তৃণা? তৃণা তাই ঐ স্বরটা শোনে উৎকর্ণ হয়ে। দু ঘরের মাঝখানের দরজা রাতে বন্ধ থাকে, দিনে একটা মস্ত ভারী সাটিনের পর্দা ঝুলে থাকে। শচীন অবশ্য বেশিক্ষণ ঘরে থাকে না, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঐ পর্দা থাকে অনড় হয়ে। কেউ কারো ঘরে যায় না। এ বাড়ির আর এক কোণে থাকে ছেলেমেয়েরা। তাদের সঙ্গেও হুটহাট দেখা হয় না। হলেও কথাবার্তা হয় বড্ড কম। একমাত্র খাওয়ার সময়ে তৃণা সামনে

থাকে। সেও এক নীরব শোকসভার মতো। সবাই চুপচাপ খেয়ে যায়। তৃণার চোখে জল আসে, কিন্তু তাতে লাভ কি? চোখের জলের মতো শক্তিশালী অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষের আর কিছু নেই। সে তখন থাকে না। যেমন, তৃণা এ বাড়িতে নেই, এ সংসারে নেই। মৃত্যুর পর বাঁধানো ফটো যেমন ঘরের দেয়ালে, সেও তেমনি। তাই তৃণা দায়ী নয়।

তৃণা ঘাড়ে গলায় পাউডারের নরম পাফ ছুঁইয়ে নেয়। সিঁদুর দেয়। সামান্য ক্রীম দু হাতের তেলোয় মেখে মুখে ঘষে। এখন আর কিছু করার নেই। সারাদিন তার করার কিছু থাকেও না বড় একটা। যে লোকটা রান্না করে সে একশ টাকা মাইনে পায়, তার অর্থ, লোকটাকে শেখানোর কিছু নেই। যে সব চাকর বা ঝি ঘরদোর গুছিয়ে রাখে তারাও নিজেদের কাজ বোঝে। তৃণা শুধু ঘুরে ঘুরে একটু তদারক করে। কখনো নিজের হাতে কিছু রাঁধে। সে কারো মুখে তেমন রোচে না, তৃণাও রান্নাবান্না ভুলে গেছে। শুধু কবে কী কী রান্না হবে সেটা বলে দিয়ে আসে। তাই হয়। কেবল নিজের ঘরটাতে সে নিজে বইপত্র গোছায়, বিছানায় ঢাকনা দেয়, ওয়ার্ডরোব সাজায়, ড্রেসিং টেবিলে রূপটানের জিনিস মনের মতো করে রাখে, কাগজ ভিজিয়ে তা দিয়ে আয়না মোছে। এ ঘরে কেউ বড় একটা আসে না। এ তার নিজের ঘর, বড্ড ফাঁকা, বড্ড বড়। রাস্তার দিকে একটা ব্যালকনি আছে, সেখানে একা ভূতের মতো কখনো দাঁড়ায়। কবিতার বই, পত্র-পত্রিকা গল্প-উপন্যাস, আর ছবি আঁকার জলরঙ, মোটা কাগজ, তুলি—এইসবই তার সারাদিনের সঙ্গী। ইদানীং সে কবিতা লেখে, দু একটা কাগজে পাঠায়। সে সব কবিতা দুঃখভারাক্রান্ত, নিঃসঙ্গতাবোধে মন্থর, ব্যক্তিগত হা-হুতাশে ভরা ভাবপ্রবণতা—এখনো ছাপা হয়নি। এক আধটা কবিতা ছাপা হলে মন্দ লাগত না তার। যে সব ছবি সে এঁকেছে তার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নারকোল গাছ, চাঁদ আর নদীতে নৌকো—

এ ছবি আঁকা সবচেয়ে সোজা। তারপরই পাহাড়ের দৃশ্য। আঁকতে তেমন শেখেনি, তুলি-রঙের ব্যবহারও জানে না। জ্যাবড়া হয়ে যায়, তবু আঁকে। ভাবে, একটা এগজিবিশন করবে নাকি একাডেমী বা বিড়লা মিউজিয়ামে! করে লাভ নেই অবশ্য, কেউ পাত্তা দেবে না। ছবি আঁকার মাথামুণ্ডুই সে জানে না। তৃণা কলেজে ভাল ক্যারম খেলত। বাড়িতে বিশাল দুই বোর্ড পড়ে আছে। একা একা মাঝেমধ্যে গুটি সাজিয়ে টুকটাক স্ট্রাইকার টোকা দিয়ে গুটি ফেলে সে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বলে খেলার কোনো টেনশন থাকে না, ক্লান্তি লাগে। নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে একবার কালো, আবার উল্টোদিকে গিয়ে নিজের হয়ে সাদা গুটি ফেলে কতক্ষণ পারা যায়?

শচীন একটানা গুনগুন শব্দে কথাহীন সুরহীন একটা গান গেয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। বনেদী বড়লোক, তাই নিজের হাতে প্রায় কিছুই করতে হয়নি তাকে, বাবাই করে গিয়েছিলেন। বাবার বিশাল সম্পত্তি চার ভাই ভাগ করে নিয়েও বড়লোকই আছে। বাড়িটা শচীনের ভাগে পড়েছে, সিমেন্টের কারবার নিয়েছে বড় ভাই, ছোটো দু ভাই নিয়েছে একজন অষুধের দোকান, অন্যজন ভাল কয়েকটা শেয়ার। শচীনরা চার ভাই-ই শিক্ষিত। সে নিজে ইঞ্জিনীয়ার, ভাল চাকরি করে বড় ফার্মে। একবার নিজের পয়সায়, অন্যবার কোম্পানীর খরচায় বিলেত ঘুরে এসেছে! পৃথিবীর সব দেশেও গেছে সে, চীন আর রাশিয়া ছাড়া। এমন মানুষ আর এমন ঘর পেলে কোন মেয়ে না বর্তে যায়! শক্তসমর্থ এবং কিছুটা নিরাসক্ত শচীন ভালবাসে ফুল, সুন্দর রঙ, ভালবাসে চিন্তাভাবনা, মানুষের প্রতি তার আগ্রহ আছে। তবু এইসব ছুটির দিনে বা অবসরে সে যখন বাগান করে, মন্থরভাবে নিজের ঘরে জার্নাল নাড়াচাড়া করে, যখন গুনগুন করে তখন তাকে বড় নিষ্কর্মা মনে হয়।

ছুটির দিনে তাই তৃণারও বাড়িতে অসহ্য লাগে। একা একরকম আর জন থাকা সত্ত্বেও একা আর একরকম।

বড় অদ্ভুত বাড়ি। সারাদিনেও একটা কিছু পড়ে না, ভাঙে না, দুধ উথলে পড়ে না, ডাল ধরে যায় না। সুশৃঙ্খলভাবে সব চলে। তৃণাকে কোনো প্রয়োজনই হয় না কোথাও। একটা অ্যালসেশিয়ান আর একটা বুলডগ বক্সার কুকুর আছে। সে দুটোরও কোনো ডাকখোঁজ নেই। কেবল শচীনের বুড়ো কাকাতুয়াটা কথা বলে পাকা পাকা। কিন্তু সে হচ্ছে শেখানো বুলি, প্রাণ নেই। অর্থ না বুঝে পাখি বলে—তৃণা, কাছে এসো…তৃণা, কাছে এসো…

পাখিটা বুড়ো হয়েছে। একদিন মরে যাবে। তখন তৃণাকে কাছে ডাকার কেউ থাকবে না।

না, থাকবে। দেবাশিস। ও একটা পাগল। এমন ভাবে ডাকে যে দেশসুদ্ধু, সমাজসুদ্ধ লোক জেনে যায়। শচীন জানে, ছেলেমেয়েরাও জেনে গেছে। তৃণার বুকের ভিতরটা সব সময় কাঁপে। কখনো নিষিদ্ধ সম্পর্কের উত্তেজনায়। কখনো ভয়ে। শচীন কিংবা ছেলেমেয়েরা তাকে বেশ্যার অধিক মনে করে না। আর দেবাশিস? সেও কি তাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবে?

কাকাতুয়াটা ডাকছে, কাছে গিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে পাখিটাকে। মস্ত দাঁড়টা ঝোলানো আছে শচীনের ঘরের বারান্দায়। যেতে হলে ও ঘর দিয়ে যেতে হবে। শচীন না থাকলে যাওয়া যেত। কিন্তু ওঘরে থেকে সমানে সুরহীন গুন্ গুন্ শব্দটা আসছে। শচীনের চোখের সামনে নিজেকে নিয়ে গেলেই তার নষ্ট মেয়েমানুষ বলে মনে হয় নিজেকে। এ বড় জ্বালা। ভদ্রলোক বলেই শচীন তাকে কিছু বলে না আজকাল। মাস ছয়েক আগে ধৈর্যহারা হয়ে একদিন চড়চাপড় আর ছাড়র ঘা দিয়েছিল কয়েকটা। তারপর থেকেই হয়তো অনুতাপ এসে থাকবে। কিন্তু তৃণা ওকে জানাবে কি করে যে ওর হাতের সেই মার বড় সুখের স্মৃতি হয়ে আছে তৃণার কাছে আজও! কারণ, তার বিবেক ও হৃদয় একটা শাস্তি সবসময়ে প্রত্যাশা করে।

তৃণা তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে উপুড় করা বইটা তুলে পড়তে বসল: কবিতার বই, বহুবার পড়া, মুখস্থ হয়ে গেছ। তবু খোলা সনেটটার দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মন দিতে পারে না। বইটা রেখে প্যাড আর কলম টেনে নেয়। কলম খুলে ঝুঁকে পড়ে, ধৈর্যহীন চঞ্চলতায় কলম উদ্যত করে নাড়ে। কিছু লিখতে পারে না। কয়েকটা রোগা লম্বা লোকের চেহারা এঁকে ফেলে, তারপর সারা কাগজটা জুড়ে হিজিবিজি আঁকতে আর লিখতে থাকে। কাগজটা নষ্ট করে দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়। আবার হিজিবিজি করে পরের কাগজটাতে।

কাকাতুয়াটা শচীনকে ডাকছে—শচীন, চোর এসেছে···শচীন, চোর এসেছে···

শচীনের ঘর এখন নিস্তব্ধ। কেউ নেই। তৃণা উঠে শচীনের ঘরে উঁকি দেয়। গোছানো ঘর। বাপের আমলের বাড়িটা শচীন আবার নতুন করে একটু ভেঙে গড়ে নিয়েছে। নতুন করে তৈরী করার জন্যই ডাক পড়েছিল দেবাশিসের। সিভিল ড্র্যাফ্‌টসম্যান আর ইন্টিরিয়র ডেকরেটর ‘ইনডেক্’-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কথাটা বড্ড ভারী, ইনডেক এমন কিছু বড় কোম্পানী নয়। কলকাতায় ওরকম কোম্পানী শতাধিক আছে। তবু ইনডেক-এর কিছু সুনাম আছে। ইন্টিরিয়র ডেকরেশন ছাড়াও ওরা ছোটোখাটো কনস্ট্রাকশন কিংবা রিনোভেশন করে। বাড়ির প্ল্যান করে দেয়। এত কিছু একসঙ্গে করে বলেই কাজ পায়। দেবাশিস দাশগুপ্ত এক সময়ে আর্টিস্ট ছিল। কমার্শিয়াল লাইনে চমৎকার নাম করেছিল সে। কিন্তু উচ্চাশা বলবতী হওয়ায় সে কিছুদিন সিনেমার পরিচালনায় হাত লাগাল। সবশেষে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে এসে মন লাগাতে পারল। আর্টিস্ট ছিল বলে, এবং রং ও ডিজাইনের নিজস্ব চোখ আছে বলে, আর পূর্বতন গুডউইলের জন্যও ওর দাঁড়াতে দেরি হয়নি। এখন চৌরঙ্গীতে অফিস করেছে। একজন সিভিল

ইঞ্জিনীয়ার, দুজন ড্র্যাফট্সম্যান, এবং আরো কয়েক জনকে মাইনে দিয়ে রেখেছে, একটি মেয়ে রিসেপশনিস্ট আছে। নিজস্ব চেম্বারটা এয়ারকণ্ডিশন করা, নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকে। একটা মরিস অক্সফোর্ড গাড়ি হাঁকড়ায়।

কিন্তু এ হচ্ছে আজকের দেবাশিস, পুরানো দেবাশিসকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

এ বাড়ি রিনোভেট করতে দেবাশিস যেদিন এল, বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে চতুর পায়ে শচীনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। চোখে উগ্র স্পৃহা, চলাফেরায় কেজো লোকের তাড়া। শচীন বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল। কোথায় দেয়াল ভেঙে ব্যালকনি হবে, কোথায় মেঝের টালি পালটাতে হবে। কোথায় নতুন ঘর তুলতে হবে, আর কেমনভাবে সাজাতে হবে, পুরোনো বাড়িটাকে আধুনিক করে তুলতে। শচীনের সঙ্গের এই লম্বাপানা সুগঠন লোকটাকে অহংকারী তৃণা খুব হেলাভরে এক-আধপলক দেখেছে, লক্ষ্য করেনি। শচীনই তাকে ডাকে—তৃণা, তোমার যে কী সব প্ল্যান আছে তা দাশগুপ্তকে বুঝিয়ে দাও···

চায়ের টেবিলে ওরা তখন বসেছে। মুখোমুখি দেবাশিস। তৃণা তার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ নীচু করে প্যাডে একটা স্টাডি রুমের ছবি এঁকে দেখাতে যাচ্ছিল, দেবাশিস একটু ভোম্বলের মতো তাকিয়ে থেকে বলে—তৃণা না?

তৃণা চমকে উঠেছিল। তাকিয়ে একটু কষ্টে চিনতে পেরেছিল দেবাশিসকে। ছেলেবেলার কথা, চিনতে তো কষ্ট হবেই।

শচীন বলে—চেনেন নাকি? উ

দেবাশিস বড় চোখে চেয়ে বলে—চেনা কঠিন বটে, তৃণার এতকাল বেঁচে থাকার কথাই নয়। যা ভুগত, ভেবেছিলাম মলাকের গেছে বুঝি এতদিনে। থাকে।

—বটে! বলে শচীন হাসে। টেনিস

—বটেই তো! দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—আমাদের মফঃস্বল শহরে পাশাপাশি বাস ছিল। ওর সব কিছু আমি জানি। ছেলেবেলায় দেখতুম, ও হয় বিছানায় পড়ে আছে, নাহলে বড়জোর বারান্দা কি উঠোন পর্যন্ত এসে হাঁ করে অন্য খেলুড়িদের খেলা দেখছে। কখনো আমাশা, কখনো টাইফয়েড, কখনো নিউমোনিয়ায় যায়-যায় হয়ে যেত, আবার বেঁচেও থাকত টিক-টিক করে। আমরা যখন ও শহর ছেড়ে চলে আসি তখন ও বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। আমার মা প্রায়ই দুঃখ করে বলত—মদনবাবুর মেজো মেয়েটা বাঁচলে হয়!

তৃণা ভারী লজ্জা পেয়েছিল। সত্যিই সে ভুগত। বলল—আহা, সে তো ছেলেবেলায়।

—তারপর তো আর তোমাকে দেখিনি। আমাকে চিনতে পারছ তো!

—পারছি।

—বলো তো কে!

—রাজেন জ্যাঠার ছেলে।

দেবাশিস হঠাৎ হাহা করে হেসে বলে—রাজেন জ্যাঠা আবার কি! আমার বাবাকে ঐ নামে কেউ চিনতই না। হাড়কেপ্পন ছিল বলে বাবার নাম সবাই দিয়েছিল কেপ্পন দাশগুপ্ত। সেটা সংক্ষেপ হয়ে হয়ে লোকে বলত কেপুবাবু। আমাদেরও ছেলেবেলায় কেউ কোন বাড়ির ছেলে জিজ্ঞেস করলে বলতুম—আমি কেপুবাবুর ছেলে।

তৃণার সবটাই মনে আছে। যারা রোগে ভোগে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়! কেপুবাবুর ছেলে দেবাশিসকে সবাই চিনত ডানপিটে হিসেবে। অমন হারামজাদা পাজি ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। এসে মনে ছেলেবেলার কথা বলে উল্লেখ করেছিল দেবাশিস তত ছেলেমানুষ নিজস্ব চেহারা ছিল না॥ তখন রোগে-ভোগা তৃণার বয়স বছর-তেরো, দেবাশিসের উনিশ কুড়ি। পাড়ার সব মেয়েকেই চিঠি দিত দেবাশিস,

একমাত্র রোগজীর্ণ তৃণাকেই তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে চিঠি লেখেনি। বহুকাল পরে সেই উপেক্ষিত মেয়েটিকে পরিপূর্ণ ঘরসংসারের চলচ্চিত্রের মধ্যে দেখে তাব বিস্ময় আব শেষ হয় না।

বলল—মেয়েদেব মুখ আমার ভীষণ মনে থাকে। নইলে তোমাকে চেনবার কথা নয়। বেঁচে আছো, তাই বিশ্বাস হতে চায় না। শচীনবাবুব ভাগ্যেই বোধ হয় বেঁচে আছো। ম্যারেজেস্ আর মেড ইন্ হেভেন। তুমি বেঁচে না থাকলে শচীনবাবুকে আজও ব্যাচেলাব থাকতে হত।

ঘটনাটা এরকম নিরীহভাবেই শুরু হয়েছিল। ইনডেক তাদের বাড়িটা ভেঙে মেরামত করছে, সাজিয়ে দিচ্ছে, ব্যালকনি বানাচ্ছে, জানালা বসাচ্ছে—সেইসব তদাবক করতে সপ্তাহে এক-আধবার আসত দেবাশিস্। ভাবী ব্যস্ত ভাবসাব, চটপটে কেজো মানুষের মতো বিদ্যুৎগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত। গম্ভীর, পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন দেবাশিস কোনোদিকে তাকাত না। দেখাশোনা শেষ কবে কোনোদিন তৃণাকে ডেকে বলত—চলি। কোনোদিন বা দূরত্বসূচক হাল্কা গলায় বলত—চা খাওয়াবে নাকি কাদম্বিনী?

ও নামটা সে নিয়েছিল রবি ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্প থেকে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' একদিন লাইনটা উদ্ধৃত করে দেবাশিস বলেছিল--তুমি হচ্ছ সেই মানুষ, মবোনি প্রমাণ করার জন্যই বেঁচে আছো, কিন্তু কি জানি, বিশ্বাস হতে চায় না।

উল্টে তৃণা এলিয়টের লাইন বলেছে—আই অ্যাম ল্যাজারাস, কাম ফ্রম দি ডেড, কাম টু টেল্ ইউ অল্, আই শ্যাল টেল্ ইউ অল······

শচীন সবসময়ে বাড়ি থাকে না। রেবা আর মনু বড়লোকের ছেলেমেয়ে যেমন হয় তেমনি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তৃণা সারাদিন একা। সে ক্যারম খেলতে পারে, টেবিল-টেনিস

খেলতে পারে, একটু আধটু ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। কিন্তু কোনোটাই তার সঙ্গী নয়। বরং কবিতার বই খুলে বসলে একরকম দূরের অবগাহন হয় তার। দেবাশিস নামকরা আর্টিস্ট, তুটো ফ্লপ ছবির পরিচালক, বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী মহলে তার গভীর যোগাযোগ। তৃণার সেইটেই অবাক লাগত। ঐ ফাজিল, মেয়েবাজ, এঁচোড়েপাকা ছেলেটির মধ্যে এসব এল কোত্থেকে?

কখনো চা বা কফি খেতে বসে দেবাশিস বলত— তৃণা, তোমার সত্যিই কিছু বলার আছে?

তৃণা অবাক হয়ে বলেছে—কী বলার থাকবে?

—ঐ যে বলো, আই শ্যাল টেল ইউ অল।

—যাঃ, ও তো কোটেশন।

—মানুষ যখন কিছু উদ্ধৃত করে তখন তার সাবকনশাসে একটা উদ্দেশ্য থাকে।

—আমার কিছু নেই।

দেবাশিস গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবত।

রেবার জন্মদিনে সেবার দেবাশিসকে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিল তৃণা। দেবাশিসের বৌ এল তার সঙ্গে। মানানসই বৌ। ভাল গড়ন, লম্বাটে চেহারা। রং কালো, মুখশ্রী খারাপ নয়। কিন্তু সারাক্ষণ কেবল টাকা আর গয়না আর গাড়ি আর বাড়ির গল্প করল। বুদ্ধি কম, নইলে বোঝা উচিত ছিল, যে-বাড়িতে বসে বড়লোকী গল্প করছে সে-বাড়ি তাদের তিনগুণ ধনী। হঠাৎ যারা বড়লোক হয় তারা টাকা দিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না, হা-ঘরের মতো বাজার ঘুরে রাজ্যের জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানায়, বনেদী বড়লোকেরা ওরকমভাবে টাকা ছিটোয় না, গরম দেখায় না। দেবাশিসের বৌ চন্দনা টাকায় অন্ধ হয়ে চোখের সামনে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। মুখে বেড়ালের মতো একটা আহ্লাদী ভাব, চোখে সম্মোহন, বার বার স্বামীকে ধমক

দিচ্ছিল। অনেক অতিথি ছিল বাড়িতে। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারেনি তৃণা। অল্প যেটুকু সময় কাটিয়েছিল তাতেই তার বড় লজ্জা করেছিল। দেবাশিসের বৌ বস্তুজগৎ ছাড়া আর নিজের সুখদুঃখ ছাড়া কোনো কিছুর খবর রাখে না!

এসব বছর-দুই আগেকার ঘটনা। বাড়ি রিনোভেট করা সন্ত শেষ হয়েছে তখন। নতুন হয়ে ওঠা বাড়ি ঝলমল করছে। তৃণা নিজের ঘরটা বেশি সাজায়নি। বেশি সাজানো ঘর তার পছন্দ নয়। তাতে তার মনের ধূসরতা নষ্ট হয়ে যায়। একটু সাদাসিধে, নরম রঙ, আর আলো-হাওয়ার ঘরই তার ভাল লাগে। ভাল লাগে বিষণ্ণতা, একা থাকা, কবিতা।

দেবাশিস বলেছিল—তৃণা, ইনডেক তোমার জন্য কিছু করতে পারল না, একটা ব্যালকনি ছাড়া।

—আমার জন্য ইনডেকের কিছু করার নেই যে, আমি ডেকরেশন ভালবাসি না।

—জানি। তুমি ক্লায়েন্ট হিসেবে যাচ্ছেতাই!

তৃণা হেসেছিল একটু।

বিপর্জ্জনক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলল—কিন্তু মেয়ে হিসেবে ইউনিক। ঠিক বয়সটিতে ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হত।

তৃণা ভয় পেয়ে বলে—ইস্!

দুঃখের মুখ করে দেবাশিস বলে—আমার বৌকে তো দেখেছো!

—দেখলাম।

—কেমন?

—সুন্দর।

—সুন্দর কিনা তা কে জিজ্ঞেস করেছে?

—তবে?

—স্বভাবের কথা বলছি।

– বাঃ! তা কী করে বলব! একবার তো মোটে দেখেছি, বেশি কথাবার্তাও হয়নি। তবে স্বভাব খারাপ নয় তো!

– ও টাকা আর স্ট্যাটাস ছাড়া কিছু বোঝে না, কোনো অনুভূতি নেই।

– তাতে কী! সব মেয়েই ওরকম।

– তুমি তো নও?

তৃণা বিষণ্ণ হয়ে বলেছে – আমার কথা ছেড়ে দাও, বহুদিন রোগে ভুগে ভুগে আমিএকটু অ্যাবনরমাল। আমি যে বেশি ভাবি, বেশি চুপ করে অন্যমনস্ক থাকি, কবিতা লিখি—এসব আমার অস্বাভাবিক মন থেকে তৈরী হয়েছে। এ-বাড়ির কেউ আমাকে তাই পছন্দ করে না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ইণ্টেলেকচুয়াল মা বলে ক্ষ্যাপায়।

—হবে।

—শোনো, নিজের বৌয়ের নিন্দে বাইরে কোরো না। ওটা রুচির পরিচয় নয়। যেমনটি পেয়েছো তেমনটির সঙ্গেই মানিয়ে চলো। তুমি বড় ছটফটে, চঞ্চল, বহু মেয়েকে চিঠি দিতে। অত মন তুলে নাও কী করে? তোমার যাকে-তাকে হুট করে ভাল লাগে, আবার হুট করে অপছন্দ হয়ে যায়। মনটা কোথাও একটু স্থির না করলে সারা জীবন ছুটে বেড়াতে হবে।

দেবাশিস মৃদু হেসে বলে – তুমি এত কথা জানলে কী করে! আমি তো এখনো তেমন করে বৌয়ের নিন্দে তোমার কাছে করিইনি। কী একটা বলতে শুরু করেছিলাম। তুমি আগ বাড়িয়ে এককাঁড়ি কথা বললে।

ভারী লজ্জা পেয়ে গেল তৃণা। আসলে তার মন বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ, একটু কিছু ঘটলেই তার পিছনে একটা বিশাল কার্যকারণ ভেবে নেওয়া তার স্বভাব। একবার আলমারী আর বাক্সের এক থোকা চাবি হারিয়ে ফেলেছিল সে, তার আগের দিন বাড়ির একটা দোখনো চাকর বিদেয় হয়েছে। চাবিটা চেনা জায়গায়

খুঁজে না পেয়েই তৃণা ভাবতে বসল, এ নিশ্চয়ই সেই চাকরটার কাজ। জিনিসপত্র কিছু হাতাতে না পেরে চাবিটা নিয়ে পালিয়েছে। এরপর গাঁয়ের লোক জুটিয়ে একদিন ফাঁক বুঝে হাজির হবে। তৃণাকে মেরে রেখে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। কাল্পনিক ব্যাপারটাকে এতদূর গুরুত্ব দিয়ে সে প্রচার করেছিল যে শচীন বাধ্য হয়ে থানা-পুলিশ করে। চাকরটার গাঁয়ে পর্যন্ত পুলিশকে সজাগ করা হয়। কিন্তু তিনদিনের মাথায় বাথরুমে সাবানের খোপে চাবিটা তৃণাই খুঁজে পায়।

তার মন ঐরকমই, দেবাশিসকে সে প্রায় অকারণে বৌয়ের ব্যাপারে দায়ী করেছে, দেবাশিস তার প্রেমে পড়ে গেছে গোছের চাপা একটা আশঙ্কাও প্রকাশ করে ফেলেছে। লজ্জা পেয়ে সে বলে—আমার কেমন যেন মনে হয় তোমাকে! সাধারণ জীবনে তুমি খুশী নও।

দেবাশিস শ্বাস ফেলে বলেছে—তা ঠিকই। তবে খুব ভয়ের কিছু নেই।

যাই বলুক, ব্যাপারটা অত নিরাপদ ছিল না। এটা বোঝা যেতই, দেবাশিস তার বৌকে ভালবাসে না। অন্য দিকে তৃণাকে ভালবাসে না শচীন। কিংবা তৃণার কল্পনাপ্রবণমন যেন সেইটাই ভেবে নেয়। মিথ্যে নয় যে, তৃণার একথা ভাবতে ভালই লাগত যে শচীন তাকে ভালবাসে না, রেবা ভালবাসে না, মনু ভালবাসে না। সংসারে কেউ তাকে ভালবাসে না। সে একা, সে বড় দুঃখী। তার এই দুঃখের কোনো ভিত্তি থাক বা না থাক, একথা ভাবতে তার ভাল লাগত। এই দুঃখই তাকে সবচেয়ে বড় রোম্যান্টিক সুখটা দিত। দুঃখের চিন্তা বা চিন্তার দুঃখ কারো কারো কাছে বড় সুস্বাদু।

দেবাশিস সেই রন্ধ্রপথের সন্ধান পেয়েছিল। এ বাড়ির অনেক ফাটা ভাঙা দুর্বল স্থান সে যেমন খুঁজে বের করে মেরামত করে

ঢেকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে, তেমনি তৃণার সঠিক দুর্বলতাটুকু জেনে নিল সে, অনায়াসে। কিন্তু সারিয়ে দিয়ে গেল না, বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তৃণার মন এমনই একটা কিছু চেয়েছিল। কোনো অঘটন, একটু পতন, একটু পাপ, সামান্য অপরাধবোধ উজ্জ্বলতম রঙের মতো স্পষ্ট করে দেয় জীবনকে। তার সেই দুর্বলতা দেবাশিস ফুলের মতো চয়ন করে নিজের বাটনহোলে সাজাল লাল গোলাপের মতো। গোলাপটা লাল কেন? তৃণা ভেবে দেখেছে। লোকলজ্জার রাঙা আভায় তা লাল। কিছু পাপ কালো, কিছু পাপ রাঙা।

রাঙা শাড়িটা পরে নিল তৃণা। সাজল। ঘড়িতে এখনো বেশি বাজেনি, সময় আছে। থাকগে। তৃণা একটু ঘুরবে। তারপর বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

॥ তিন ॥

পেট্রল পাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে দেবাশিস আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। হাই তুলতে তুলতেই বলল—বিশ লিটার। বলে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করে দিল।

রবি নেমে আইসক্রীমের স্টলটার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে—বাবা, বন্ধ যে।

—কী আর করা যাবে।

রবি বুটের শব্দ তুলে ছুটে আসে—আজ কেন বন্ধ?

—একটু পরে খোলে। চলো, তোমাকে ক্যাণ্ডি কিনে দেবো।

গাড়ির ভিতর থেকে চাঁপা ডেকে বলে—সোনাবাবু, তোমার জন্য আমি তো খাবার এনেছি, বাইরের জিনিস তবে কেন খাবে?

রবি তার বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোটো চোখে বাবাকে একটু দেখল। প্যাণ্ট শার্ট পরা দীর্ঘকায় বাবা, গলায় একটা সিল্কের

ছাপা সাদা-কালো স্কার্ফ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাবা জুতোর আগাটা তুলছে নামাচ্ছে, পকেটে হাত, ভ্রু কোঁচকানো।

রবি ডান পা বাড়িয়ে, ডান হাত মুঠো করে তুলে মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে বক্সিংয়ের স্ট্যান্স তৈরী করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতটা বাবার পেটে চালিয়ে দিয়ে মুখে শব্দ করে—হোয়্যাম্!

দেবাশিস কোলকুঁজো হয়ে সরে যায়। তারপর সেও ফিরে দাঁড়ায়। অবিকল রবির মতো স্ট্যান্স নিয়ে এগিয়ে ভুয়ো ঘুঁষি মারে তার মুখে, রবি চট্ করে মুখটা সরিয়ে নিয়ে ঘুরে এগিয়ে আসে। নিঃশব্দে দুজন দুজনের দিকে চোখ রেখে চক্কর খায়, ঘুঁষি চালায়। চাঁপা গাড়ি থেকে মুখ বের করে স্মিত চোখে চেয়ে থাকে। পেট্রল ভরতে ভরতে পাম্পের অ্যাটেনডেন্ট লোকটা খুব হাসে।

দেবাশিস পেটে একটা ঘুঁষি খেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে। সামনে তেজী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রবি রেফারির মতো গুনতে থাকে—ওয়ান···টু··· থ্রি···এইট···নাইন আউট! বলে শূন্যে আঙুল তোলে রবি।

দেবাশিস উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বলে—কংগ্র্যাচুলেশনস ফর জাস্ট বিয়িং দা নিউ হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দা ওয়ার্ল্ড।

—থ্যাংক্স্। রবি হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। মৃদু হাসে' তারপর আস্তে করে বলে—মে আই পুট থ্রু এ টেলিফোন কল?

—টু হুম?

—মাই ফ্রেণ্ড রঞ্জন।

—গো এহেড।

দ্বিধাহীন গটমটে পায়ে রবি কাচের দরজা ঠেলে গিয়ে অফিস ঘরে ঢোকে। ফোন তুলে নেয় চালাক চতুর ভঙ্গিতে। দেবাশিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। শুনতে পায় রবি বলছে—হেল্লো, ইজ রঞ্জন অ্যারাউণ্ড? ···ইয়েস, রঞ্জন, দিস ইজ রবি—

আউট ফর ফান···ফার্স্ট টু জু, দেন টু মণিমা অ্যাট মানিকতলা ···ইয়েস। ওঃ নো, নট মহেশতলা, মানিকতলা···এম ফর···এম ফর···

দরজার কাছ থেকে দেবাশিস প্রম্পট্ করে—মীরাট।

চোখের কোণ দিয়ে দেবাশিসকে একবার দেখে নিয়ে মাথা নাড়ে রবি। ফোনে বলে—এম ফর মাদার। এ ফর···

—এলাহাবাদ। বলে দেবাশিস।

—এলাহাবাদ। রবি প্রতিধ্বনি করে—অ্যাণ্ড এন ফর নিউ দিল্লী, আই ফর ইণ্ডিয়া।

দেবাশিস আস্তে সরে আসে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে। অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরায়। কথাটা কানে বিঁধে থাকে। এম্ ফর মাদার।

রবি যখন গাড়িতে এসে উঠল দেবাশিস একটু গম্ভীর। গাড়ি ছেড়ে চালাতে চালাতে বলে—তুমি ওভাবে স্পেলিং করছিলে কেন? ফোনে স্পেলিং করতে জায়গার নাম বলাই সুবিধে। মাদার কি কোনো জায়গা?

রবি একটু শিশুর হাসি হাসে। বলে—জায়গাই তো!

—জায়গা? মাদার আবার কি রকম জায়গা?

—যেমন মাদারল্যাণ্ড!

দেবাশিস হাসে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে—কিন্তু তুমি তো শুধু মাদার বললে, ল্যাণ্ড তো বলোনি।

লজ্জায় দু হাতে চোখ ঢেকে একটু হাসে রবি। বলে—ভুল হয়েছিল।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে দেবাশিস। রবি এখনো ভোলেনি, শুধু চেপে আছে। ওর ভিতরে হয়তো কষ্ট হয় মায়ের জন্য। কে জানে!

রবি সীটের উপর হাঁটু মুড়ে বসেছে, মুখে আঙুল, ঢুলছে সীটের ওপর চাঁপা সতর্ক গলায় বলে—পড়ে যাবে সোনাবাবু।

—তোমার কেবল ভয়। বলে রবি ইচ্ছামতো দোল খায়। বলে—বাবা, আমি পিছনের সীটে বসব, দিদির কাছে?

—যাও। দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে।

চাঁপা হাত বাড়িয়ে সীটের ওপর দিয়ে পিছনে টেনে নেয় রবিকে।

সারাক্ষণ এরকমই করে রবি। একবার পিছনে যায়, একবার সামনে আসে। দুষ্টু হয়েছে খুব। কিন্তু দেবাশিস ওকে বকে না। মায়া হয়। ওর কি বড় মায়ের কথা মনে পড়ে?

দেবাশিস চন্দনাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। একটা সময় অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল তার। কাকে বিয়ে করবে তার কিছু ঠিক ছিল না। চন্দনা ছিল সেসব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী আর কৌশলী। কুমারী অবস্থায় সে গর্ভে দেবাশিসের সন্তান নেয়। সেই অবস্থায়. তাকে ফেলতে পারার সাধ্য দেবাশিসের হয়নি। চন্দনা সন্তান নষ্ট করতে দেয়নি। বলেছে—তুমি যদি বিয়ে না করো না করবে, ও আসুক কুমারী মায়ের কোলে।

সেটাই ছিল ওর কৌশল! দেবাশিস ছ মাসের গর্ভবতী চন্দনাকে বিয়ে করে আনল। যথাসময়ে রবি হ'ল। ওর চার বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল চন্দনা।

বড় রাগী ছিল, ভেবেচিন্তে কিছু করত না।

তৃণার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্কটা তখনো তৈরী হয়নি। তৃণা মাঝে-মধ্যে তাকে ডাকত ছবি আঁকার স্থলুকসন্ধান জানতে। ওটা তখন তার বাই। জলরঙা ছবি আঁকতে গিয়ে তুলির জ্যাবড়া দাগ আর অসহিষ্ণু টান দিয়ে হয়রান হত। দেবাশিস তাকে তুলি চালাতে শিখিয়েছিল। দুটো রঙের মাঝখানে কি ভাবে একটা রঙের সঙ্গে আর একটাকে মেলাতে হয় তার কৌশল অভ্যাস করাত। কিন্তু তাতে সময়টা নিত বড্ড বেশি। ব্যস্ত দেবাশিস তার অর্থকরী সময়টা যে নষ্ট করছে তা খেয়াল করত না। বড় ভাল লাগত।

তৃণা দেখতে খুব সুন্দর তা তো নয়, উপরন্তু বিবাহিতা, দুটি বড় বড় সন্তানের মা, এমন মেয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ বড় অদ্ভুত দেবাশিসের পক্ষে। সে তো মেয়ে কিছু কম দেখেনি। তৃণার প্রতি এই দুর্বলতার তবে কারণ কি?

কারণ একটাই, কৈশোরকাল। সেই বয়সটার যাবতীয় স্মৃতিই বড় মারাত্মক। তৃণার মধ্যে আর কিছু না থাক, ছিল সেই স্মৃতির সৌরভ তাকে ঘিরে। রোগা দুঃখী সেই কিশোরী মেয়েটাকে সে কবে ভুলে গিয়েছিল। দুরন্ত সময় তাকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে তার কাছে। আর একটা কারণ চন্দনা নিজে।

তৃণার সুখের ঘর কেন ভাঙতে যাবে দেবাশিস? সে ভাল লোক ছিল না কোনোদিনই। তবু তার তো রুচি ছিল। সুযোগ পেলে সে যে-কোনো মেয়েকেই উপভোগ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগল হয় না তো কারো জন্য! আর তৃণা পাগল-করা মেয়েও নয়। যদিও তৃণার বয়স গড়িয়ে যায়নি, তবু তো ছেলেমেয়ের মা, গিন্নিবান্নি! এখন কি আর চোখে রঙ ছুঁড়ে দেয়ালা করে কেউ? ছবি-আঁকার ছলে তারা পরস্পরের দীর্ঘ-শ্বাস শুনেছিল। একজনের ছিল শচীন, অন্যজনের ছিল চন্দনা। তবু এও ঠিক, পৃথিবীতে কেউ কারো নয়।

দেবাশিস একটা জীবন যদি মেয়েবাজি না করত তবে তার চরিত্রে রাশ টানার অভ্যাস হত। কিংবা যদি চন্দনা হত মনের মতো বৌ, তবে রাশ টানতে পারত চন্দনাই।

তা হল না। চন্দনা তাকে ঘরে টিকতে দিত না। কেবলই বলত—কোথায় ছবি আঁকা হচ্ছে, সব আমি জানি। তুমি মরো।

তখন সুন্দর ফ্ল্যাটটায় বাস করে তারা। লিফ্‌টে ওঠে নামে। গ্যারেজে গাড়ি। রবি তখন অজস্র কথা বলে। সংসারটা সবে জমে উঠেছে।

একদিন ছুটির সকালে চন্দনা দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। রবি ঘুমন্ত মাকে জ্বালাচ্ছিল খুব। উঠেই ঘা কতক দিল রবির পিঠে

যখন মারত তখন বড় নির্মমভাবে মারত, মায়া করত না, আবার একটু পরেই হামলে আদর করত। চন্দনার মাথায় একটু ছিট তো ছিলই।

সেদিন সকাল থেকেই চন্দনা বিগড়ে গেল।

দেবাশিস রোজকার মতো বসেছিল তার বাইরের ঘরে। সামনে খোলা স্টেটস্‌ম্যান, টুলের ওপর রাখা পা, পায়ের পাশে কফির কাপ। চন্দনা এসে স্টেটস্‌ম্যানটা কেড়ে নিল হাত থেকে। বলল —কী ভেবেছো তুমি ?

—কী ভাববো ? ক্লান্ত দেবাশিস জবাব দেয়।

—কত লোক অন্যায় করে ধরা পড়ে। তুমি কেন পড়ো না ?

দেবাশিসের মনে পড়ে, সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছিল—হে ঈশ্বর, চন্দনা কেন বেঁচে আছে ? মুখে বলেছিল—চুপ করো।

চন্দনা চুপ করল না। অসম্ভব রেগে গেল। উল্টোপাল্টা বকতে লাগল দেবাশিসকে। গালাগাল দিল অজস্র। অবশেষে কাঁদল এবং কাঁদতে কাঁদতেই অসংলগ্ন বকতে লাগল একা—তুমি আমার বাবাকে ঠকিয়েছো···আমার ছেলেকে ঠকিয়েছো···তুমি আমাকে লুকিয়ে টাকা জমাও···

এসব কথা বাস্তব সত্য নয়। কোনো মানেও হয় না। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার মত দিল—অজস্র মাথাধরার বড়ি, ঘুমের পিল, তার ওপর নিজের নির্ধারিত অসুখের জন্য নিজস্ব প্রেসক্রিপশনে খাওয়া অষুধ, দুশ্চিন্তা উদ্বেগ—সব মিলেমিশে একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

সেই মানসিক ভারসাম্যহীনতা আর স্নায়ুর বিকার থেকে কোনো দিনই সুস্থ হতে পারেনি চন্দনা। একদিন মরল। সাততলা থেকে সোজা লাফিয়ে পড়ল। তখন খুব ভোর। দেবাশিস আর রবি তখনো ওঠেনি।

দেবাশিস অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেল কোর্ট থেকে। কিন্তু বেঁচে চন্দনা যতটা না ছিল, মরে তার চেয়ে ঢের বেশি ফিরে এল জীবনে। তাকে ভুলতেই তখন তৃণার পিপাসা ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে তোলে দেবাশিস। যা অবৈধ তার মতো মাদক আর কী আছে!

—বাবা! রবি ডাকে।

—উঁ। দেবাশিস অন্যমনস্ক উত্তর দেয়।

—চিড়িয়াখানায় আমরা কেন যাচ্ছি?

—যাবে না?

—অনেকবার গেছি তো। ভাল লাগে না।

বিস্মিত দেবাশিস প্রশ্ন করে—তবে কোথায় যাবে?

রবি লজ্জার সঙ্গে বলে—বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

—তবে?

—মণিমার কাছে চলো।

—ও। দেবাশিস গাড়ি ধীর করে একটু হাসে। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে—ঠিকই তো! সব ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা কি আর ভাল লাগে!

—ফিরে যাই চলো।

দেবাশিস মাথা নেরে বলে—পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্টুরেন্টে কী যেন খাবে বলেছিলে। খাবে না?

রবি তার চালাক হাসিটা হেসে বলে—পিঁপিং।

দেবাশিস বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে— যাবে না?

—যাবো। বুড়োদা, নিনকু, পল্টু, থাপি, ঝুমু আর মানির জন্য নিয়ে যাবো। ওদের বলেছিলাম যে রবিবারে পিঁপিঙের খাবার খাওয়াবো।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ। রবি হাসে।

স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে দেবাশিস। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা আমাকে খুব ভালবাসে।

—জানি তো।

—বুড়োদা, নিনকু, পল্টু সবাই।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। খুব ভালবাসে। গেলে ছাড়তেই চায় না। বলে—তুই আমাদের কাছে থাক ।

—ও।

—আমি কেন ওদের কাছেই থাকি না বাবা ? মণিমা সকলের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসে।

দেবাশিস সামান্য গম্ভীর হয়ে যায়। প্রথমটায় কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ রবি নিঃশব্দে বাবার মুখখানা চেয়ে দেখে। মুখ দেখে বোধ হয় বুঝতে পারে, বাবা খুশী হয় নি।

পিছন থেকে চাঁপা বলে—তুমি বাড়ীতে না থাকলে আমরা কার কাছে থাকবো সোনাবাবু ? বাবার যে তোমাকে ছাড়া ভীষণ মন-খারাপ হয়।

—অল্প ক'দিন থাকব। রবি উত্তর দেয়।

—তারপর চলে আসবে ? চাঁপা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। আমিও তো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

ময়দানের ভিতর দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে দেয় দেবাশিস। এম ফর মাদার—কথাটা ভুলতে পারে না সে। তার ফ্ল্যাটবাড়িতে চন্দনার কোনো ফটো নেই। ইচ্ছে করেই চন্দনার সব ফটো সে তার লকারে চাবি দিয়ে রেখেছে, যাতে রবির চোখে না পড়ে। এই বয়সে মাতৃহীনের মায়ের কথা বেশি মনে পড়া বড় কষ্টকর। চন্দনার শাড়ি পোশাক, রূপটানের সব জিনিসপত্র, তার হাতের লেখা কাগজ কিংবা যত চিহ্ন ছিল সবই সরিয়ে দিয়েছে দেবাশিস,

শাড়িগুলো বিলিয়ে দিয়েছে একে-ওকে। মানিকতলার বোন ফুলিকে কয়েকটা দামী শাড়ি দিয়েছিল, ও নিতে চায়নি তবু জোর করে দিয়েছিল দেবাশিস – পড়ে থেকে নষ্ট হবে, তুই পর।

একদিন মনের ভুলে ফুলি একটা জয়পুরী ছাপওলা সিল্কের শাড়ি পরেছিল রবির সামনে। রবি হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখল শাড়িটা, তারপর মুখখানায় হাসি-কান্না মেশানো 'একরকম অদ্ভুত ভাব করে বলল – মণিমা, আমার মায়ের ঠিক এরকম একটা শাড়ি ছিল।

শিশুদের মনের খবর রাখা খুবই শক্ত। ওদের স্মৃতি কত দূরগামী, কত ছবির মতো স্পষ্ট ও নিখুঁত তা বুঝতে পেরে একরকম অদ্ভুত যন্ত্রণা পেয়েছিল দেবাশিস। পারত-পক্ষে সে তার মায়ের কথা বলে না। জানে, সে মায়ের কথা বললে তার বাবা খুশী হয় না। এতটা বুদ্ধি ঐ শিশুমাথায়!

বুকের ভিতরটা চল্‌কে ওঠে দেবাশিসের। ছেলের প্রতি হঠাৎ ভালবাসায় ছট্‌ফট্‌ করে। পার্ক স্ট্রীটের একটা বড় রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামিয়ে রবিকে নিয়ে নামে। রেস্টুরেন্টে বসে মেনুটা রবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে – তোমার যা ইচ্ছে অর্ডার দাও। যা খুশি।

বলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

রবি অবাক হয়ে বাবার দিকে চায়। মিট্‌মিটে্‌ চোখে বাবার মুখখানা দেখে বলে—আমার তো ক্ষিদে নেই।

দেবাশিস হতাশ হয়ে বলে—সে কী!

রবি মাথা নেড়ে বলে—দিদি সকালে কত খাইয়েছে! বলতে বলতে গেঞ্জিটা ওপর দিকে তুলে পেটটা দেখিয়ে বলে—পেট ছাখো কেমন ভর্তি।

দিনের মধ্যে একশবার রবির গায়ে হাত দিয়ে দেখত চন্দনা, টেম্পারেচার আছে কিনা! রবির গায়ে হাত দিয়ে আবার নিজের

গা দেখত, কখনো বা দেবাশিসকে ডেকে বলত—দেখি তোমার গা, রবির চেয়ে ঠাণ্ডা না গরম।

সব মায়েরই এই বাতিক থাকে। তার নিজের মায়েরও ছিল। আরও, দিনে একশবার রবিকে খাওয়ানোর জন্য মাথা কুটত চন্দনা, খাইয়ে পেট দেখত। খেতে না চাইলে অনুনয়-বিনয়, খোশামোদ, তারপর কিলচড় কষাত। বলত—না খেয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবি। আমি মরলে আর কেউ তোর খাওয়া নিয়ে ভাববে ভেবেছিস?

খাওয়ার ব্যাপার হলেই ছোট্ট রবি মাকে পেট দেখাত।

গেঞ্জিটা নামিয়ে করুণ চোখে চেয়ে রবি বলে—খাবো না বাবা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা তো মুর্গী খায় না।

—দেবাশিস খেয়াল করল। বলল—তাই তো! কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিলাম যে।

—মণিমার জন্য কী নেবে?

—তুমিই বলো।

—সন্দেশ আর দৈ, হ্যাঁ বাবা?

—আচ্ছা।

রবি খুশী হয়ে হাসল। দেবাশিস রবির কথা শোনে। রবি যা চায় তাই দেয়। রবির যা ইচ্ছে তাই হয়। চন্দনার সময়ে তা হত না। রবি কিছু বায়না করলেই ক্ষেপে যেত চন্দনা। বকত। মারত। তবু সারাদিন চন্দনার পায়ে পায়ে ঘুরত রবি। বকা খেত, মার সহ্য করত, তবু আঁটালির মতো লেগেও থাকত।

ঐ রাগী আহাম্মক মেয়েটার মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু কি ছিল? ভেবেই পায় না দেবাশিস। যে অবস্থায় চন্দনার বিয়ে হয়েছিল তাতে তার বাপের বাড়ির দিকের কেউ খুশী হয়নি। চন্দনার বাবা

তাকে প্রচণ্ড মারধর করে বেঁধে রেখেছিলেন, মা কাঁদতে কাঁদতে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই গোলমাল হাঙ্গামার ভিতর থেকে চন্দনাকে খুব শালীনতার সঙ্গে বিয়ে করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দেবাশিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন ওদের বাড়ি চড়াও হয়। পাড়ার ছেলেদের আগে থাকতেই মোটা পুজোর চাঁদা দেওয়া ছিল। দেবাশিস চন্দনার বাবাকে শাসিয়ে এল—ফের ওর গায়ে হাত তুলবেন তো মুস্কিল আছে।

চন্দনার বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। আজকাল ভদ্রলোক মানেই ভেড়ুয়া। এরপর থেকে চন্দনার ওপর অত্যাচার কমে গেল বটে, কিন্তু বাড়ির লোক তার সঙ্গে কথা বলত না। দেবাশিস তখন মানিকতলার বোনের বাড়িতে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। একজন গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে তোলা ভগ্নীপতি ভাল চোখে দেখেনি। বোনও রাজি ছিল না। চন্দনা প্রায়ই টেলিফোন করে বলত—বেশি কিছু তো চাইনি, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দাও। তাহলেই হবে।

দেবাশিস বলত—তা হবে না। সেটা তো পরাজয় মেনে নেওয়া। আমি তোমাকে ফুল ফ্লেজেড বিয়ে করে নিজের বাসায় তুলব।

তাই করেছিল সে। পাগলের মতো ঘুরে যাদবপুরে বাসা ঠিক করে ফেলল। হাতে টাকার অভাব ছিল না। প্রচুর গয়না শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া করে পুরুত ডেকে বিয়ে করল। চন্দনার এক দাদা সম্প্রদান করে যান।

চন্দনার মতো একটা অপদার্থ মেয়ের জন্য অত পরিশ্রম আর হাঙ্গামা কেন করেছিল দেবাশিস, তা ভাবলে অবাক লাগে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই চন্দনার তাগাদায় অভিজাত পাড়ায় অনেক টাকা দিয়ে পূব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট কিনল। এই বিপুল উদ্যোগ বৃথা গেছে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই দেবাশিস বুঝতে পারে, বিয়ে কোনো স্বর্গীয় বিধি নয়। চন্দনা তার বৌ হওয়ার উপযুক্তই নয়। এক

অগভীর মন, এত রাগ, অধৈর্য, এমন অর্থকেন্দ্রিক মন-সম্পন্ন মেয়ের সঙ্গে কী করে থাকবে সে। নিজে চরিত্রহীন হলেও তার কিছু শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতা আছে, সামান্য কিছু ব্যবসায়িক সততা, কর্মনিষ্ঠা। তার মনে হত সারাদিন কাজের পর পুরুষ যখন বাসায় ফেরে তখন দগ্ধদিনে ছায়ার মতো স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেয়। স্ত্রী হচ্ছে বিশ্রামের জায়গা।

দেবাশিস প্রায়দিনই বাসায় ফিরে চন্দনাকে দেখতে পেত না। হয় মার্কেটিং, নয় সিনেমা-থিয়েটার, নয়তো বাপের বাড়ি চলে যেত চন্দনা। বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে যেন নিদারুণ ভাল হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে নিঃসঙ্গ তৃণা এক নিভৃত জলস্রোতে নৌকোর মতো তার কাছাকাছি এসে গেল। উতরোল স্রোত। কিন্তু নিশ্চিত। দেবাশিস কোনোদিনই কারো প্রেমে পড়েনি এতকাল। এবার পড়ল। এক অসহনীয় অবস্থায়। অসম্ভব এক প্রেম।

রবি এখন ঐ তার মুখোমুখি বসে আছে। কী চোখে রবি চন্দনাকে দেখেছিল তা ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। ঐ রাগী, অপদার্থ, অগভীর মাকে কেন অত ভালবাসত রবি? রবির কাছ থেকে তা জেনে নিতে ইচ্ছে হয়! জানতে ইচ্ছে করে, কোনোভাবে না কোনোভাবে ভালবাসার কোনো উপায ছিল কিনা!

বেয়ারা মস্ত একটা বাদামী কাগজের প্যাকেটে মোড়া বাক্স নিয়ে এল ট্রেতে। সঙ্গে বিল। দাম আর টিপস্ মিটিয়ে উঠে পড়ে দেবাশিস। ঘড়ি দেখল। এখনো অনেক সময় আছে। চিড়িয়াখানার সময়টা বেঁচে গেল।

॥ চার ॥

পোশাক যতই পরুক, আর যতই সাজুক, তৃণার মুখের দুঃখী ভাবটা কখনো যায় না। একটা অপরাধবোধে মাখা মুখখানায় করুণ হাসিহীন, শুকনো ভাব ফুটে থাকেই। চোখে ভীরু চঞ্চল ভাব!

বেরোবার মুখে দেখল, হুড়মুড় করে করে সাইকেল নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে এল মন্নু। চমৎকার লালরঙা স্পোর্টস সাইকেল। মন্নুর চেহারা বেশ বড়সড়। পরনে সাদা শর্টস্, সাদা গেঞ্জি, কাঁধে একটা টার্কিশ তোয়ালে, পায়ে কেড্স আর মোজা। হাত পায়ের গড়ন সুন্দর, বুকেব পাটা বড়। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। মাটিতে পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা গাড়িবাবান্দার তলায় দাঁড় করাল। চোখ তুলে মৌন মুখে মাকে দেখল একবার।

ভারী পাল্লার কাছের দরজার সঙ্গে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল তৃণা। বুকের ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। ছেলের চোখে চোখ পড়তেই, হাত পায়ে সাড় থাকে না। মন্নু আজকাল কদাচিৎ কথা বলে। দিনের পর দিন একনাগাড়ে উপেক্ষা কবে যায়।

কাচেব দরজার কাছ থেকে একটুও নড়তে পাবল না তৃনা। মন্নু সাইকেলে বসে থেকেই সাইকেলের ঠেস দেওয়ার কাঠিটা পা দিয়ে নামাল। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে লম্বা পায়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তৃণার দিকে এক পলক দেখল আবার। চৌদ্দবছরের ছেলের আন্দাজে মন্নুকে বড় দেখায়। চেহারাটা তো বডই, চোখের দৃষ্টিতেও পাকা গাম্ভীর্য, এটা বোধ হয় ওর বাপের ধারা। বয়সের আন্দাজে ওর বাপও গম্ভীর, বয়স্কজনোচিত হাবভাব।

সামনেই মস্তো কয়েরের পাপোষ পাতা। মন্নু তার কেড্সটা ঘষে নিচ্ছিল, দরজার চৌকাঠে হাত রেখে। ওর শরীবের স্বেদগন্ধ, রোদের গন্ধ তৃণার নাকে এল। সে যে এই বড়সড় সুন্দর চৌখস ছেলেটির মা তা কে বিশ্বাস করবে! চেহারায় অমিল, স্বভাবে অমিল, তার ওপর মন্নু আজকাল ডাকখোঁজ করেই না। কতকাল 'মা' ডাক শোনেনি তৃণা।

তাকে কাচের দরজায় অমন সিঁটিয়ে থাকতে দেখে মন্নু আবাব একবার তাকাল। ভ্রূ কোঁচকাল। মনে মনে,বোধ হয় কী একটু শুঁকে নিল বাতাসে। হঠাৎ চূড়ান্ত তরল গলায় বলল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স! না?

তৃণা ভারী চমকে ওঠে। সত্যি কথা। সে যে সেন্টটা আনিয়েছে তা চ্যানেল নাম্বার সিক্স। কিন্তু এত ঘাবড়ে গিয়েছিল তৃণা যে উত্তর দিতে পারল না। কেবল বিশাল দুটি চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে, ভূতগ্রস্থের মতো। কারণ, ছেলের চোখে চোখ রাখতে আজকাল তার মেরুদণ্ড ভেঙে নুয়ে যায়।

মনু অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে না। চটপটে পায়ে ভিতরবাগে চলে যায়, লবি পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে। ও এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে, পোশাক পরবে, তারপর বেরোবে কোথাও।

ওর চলে-যাওয়ার রাস্তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে তৃণা। তক্ষুনি বেরোতে পারে না। আস্তে আস্তে ঘুরে আসে। অনেকখানি মেঝে পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে দোতলায়। একটু বিশ্রাম করে যাবে।

মনু আর রেবার ঘর বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে হল, হলে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে সে মৃদু একটা শিসের শব্দ শোনে। এক পা এক পা করে এগোয় দক্ষিণের দিকে। এদিকে সে আজকাল একদম আসে না। এলে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হয়, ভ্রূ কোঁচকায়, সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করে। এবাড়িতে সে এক পক্ষ, আর ছেলে মেয়ে বাপ মিলে আর এক পক্ষ। মাঝখানে অদৃশ্য কুরুক্ষেত্রে বিচিত্র সব চোখের বাণ ছোটাছুটি করে, আর মৌনতার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের দিকে।

মনুর ঘরে মনু আছে। দরজা আধখোলা, পর্দা ঝুলছে। অন্যপাশে রেবার ঘর। ঘরটা নিস্তব্ধ, তৃণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, ভিতরে কোনো শব্দ নেই। খুব দুঃসাহসে ভর করে সে কাঁপা, ঠাণ্ডা, দুর্বল হাতে পর্দা সরিয়ে ভিতরে পা দেয়। ফাঁকা ঘর। একধারে বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, ওয়ার্ডরোব, আলমারী, মাঝখানে দামী চেয়ার কয়েকটা। নীচু সেন্টার টেবিলে তাজা ফুল রাখা।

ঘরভর্তি মৃদু ধূপকাঠির সৌরভ। রেবার বয়স বারো, কিন্তু সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার মতোই থাকে। তৃণা ফোম রাবারের গদিঅলা বিছানাটায় একটু বসে। বুকজোড়া ভয়। পড়ার টেবিলের ওপর স্ট্যাণ্ডে রেবার ছবি। পাতলা গড়নের ধারাল চেহারা। নাকখানা পাতলা ফিনফিনে, উদ্ধত। টানা চোখ। গাল ভাঙা, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। সে তুলনায় মন্নুর চেহারাটা একটু ভোঁতা, রেবার মতো বুদ্ধি মন্নু রাখে না। রেবা মডার্ন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। সম্ভবত হায়ার সেকেণ্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করবে। মন্নু অত তীক্ষ্ণ নয়, সে কেবল টেনিস কিংবা অন্য কোন খেলায় ভারতের এক নম্বর হতে চায়। হাসিখুশি আহ্লাদি ছেলে, মনটা সাদা। সেই কারণেই বোধ হয় কখনো সখনো মন্নু এক আধটা কথা তার মার সঙ্গে বলে ফেলে।

কিন্তু রেবাব গাম্ভীর্য একদম নীরেট আর আপসহীন। যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনই তীক্ষ্ণ তার উপেক্ষার ভঙ্গি। যতরকমভাবে অপমান এবং উপেক্ষা করা যায় ততরকমই করে রেবা। মার প্রতি মেয়ের এমন আক্রোশ কদাচিৎ কোনো মেয়ের মধ্যে দেখা যায়। মন্নুকে যতটা ভয় করে তৃণা, কিংবা শচীনকে, তার শতগুণ ভয় তার রেবাকে। মেয়েদের চোখ আর মন সব দেখে, সব ভাবে। ফ্রক-পরা রোগা মেয়েটাকে তৃণা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ মানুষ বলে জানে।

ঘরে ধূপকাঠির গন্ধ, স্নো ক্রীম ফাউণ্ডেশনের গন্ধ, ঘর-সুগন্ধির মৃদু সুবাস। দেয়ালের রঙ হাল্কা নীল, আর সবুজ। বিপরীত দেওয়ালগুলি একরঙা। নানারকম আলোর ফিটিংস লাগানো, জানালা দরজায় পর্দা, পেলমেটে কেষ্টনগরের পুতুল সারি সারি সাজানো। বুককেসের ওপর একটা রেডিও, টেপরেকর্ডার, একধারে রেকর্ডপ্লেয়ার আর রাশীকৃত রেকর্ডের অ্যালবাম। সমস্ত বাড়িটাই দেবাশিস সাজিয়েছিল। আসবাবপত্রগুলি সবই সাপ্লাই দিয়েছিল তার কোম্পানি।

ফটো-স্ট্যাণ্ডে রেবার ছবিটার দিকে ভীত চোখে চেয়ে ছিল তৃণা। তার মনে হচ্ছিল, সে রেবার মুখোমুখি বসে আছে। রেবা তাকে দেখছে। ফটোতে রেবার সুন্দর হাসিটা যেন আস্তে আস্তে পাল্টে শ্লেষ আর ঘৃণার হাসি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণার বুক কেঁপে কান্নার গন্ধ মেখে একটা শ্বাস বেরিয়ে আসে। দূরে বৃষ্টি হলে যেমন জলের গন্ধ আনে বাতাস তেমনি কান্নাটা ঘনিয়ে উঠছে। গন্ধ পায় তৃণা। কিন্তু বৃথা। কত তো কেঁদেছে তৃণা, কেউ পাত্তা দেয় নি।

তৃণা বহুকাল এই বাড়ির এদিকে আসেনি। রেবার ঘরে ঢোকেনি। এখন একা চোরের মতো ঢুকে তার বড় ভাল লাগছিল। বারো বছর বয়সে মেয়েরা মায়ের বন্ধু হয়ে ওঠে। এই বয়ঃসন্ধির সময়ে কত গোপন মেয়েলি তথ্যের লেনদেন হয় মা আর মেয়ের মধ্যে, এই বয়সেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় পাকা। মেয়ে আর মেয়ে থাকে না, সখী হয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়, রেবার সঙ্গে তৃণার কোনোদিনই আর সখিত্ব হবে না। ভীতু তৃণাকে মানসিক ভারসাম্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেবে রেবা। বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠুর ঐ মেয়েটা।

তৃণা উঠল, রেবা গানের স্কুলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে, কিন্তু নিঃশব্দে ফিরবে না। ওর ছটফটে দৌড়-পায়ের আওয়াজ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়। তাই সাহস করে তৃণা উঠে ঘুরে ঘুরে ওর ঘরটা দেখে। বুককেস খুলে বই হাতড়ায়। ওয়ার্ডরোবের ভিতরে ওর হরেক ফ্রক, ঘারারা, প্যারালেলস আর শাড়িতে হাত বুলিয়ে দেয়। বিছানার ওপর একটা নাইটি পড়ে আছে। ভীষণ পাতলা একটা বিদেশী কাপড়ের তৈরী। সেটা গুছিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয়। বেডকভারটা টান করে একটু। পড়ার টেবিলটা সাজানো আছে। তবু একটু নেড়েচেড়ে রেখে দেয়, খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটা ড্রইং খাতা পায় তৃণা, তাতে জলরঙা সব

ছবি আঁকা। বুকের ভিতরটা ধুপধুপ করে ওঠে। রেবা কি ছবি আঁকে ?

বুককেসের মাথায় রঙের বাক্স আর তুলির আণ্ডিল খুঁজে পায় তৃণা। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, রেবা ছবি আঁকে। দরজার পাশে একটা নীচু শেল্‌ফে তবলা ডুগি, হারমোনিয়ম, তানপুরা সব সাজানো। হারমোনিয়ামের বাক্সের ওপর একটা কবিতার বইও পেয়ে যায় সে। বুকে একটা আনন্দ সদ্যোজাত পাখির ছানার মতো শব্দ করে। রেবা কি কবিতা পড়ে?

আবার গিয়ে বুককেসটা খোলে তৃণা। বইগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা নেই। তাই অসুবিধে হয়। তবু একটু খুঁজতেই তার মধ্যে কিছু কবিতার বই খুঁজে পায় তৃণা। অবাক হয়ে উল্টেপাল্টে বইগুলো দেখে, সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যায়।

অন্যমনস্কতাবশত সে পায়ের শব্দটা শুনতে পায়নি, যখন শুনল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

পর্দা সরিয়ে রেবা ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগা তীক্ষ্ণ মুখখানা হঠাৎ সন্দিগ্ধ আর কুটিল হয়ে উঠল। ভ্রু কোঁচকানো, রেবা তার দিকে একপলক চাইল, তারপর চোখ ফিরিয়ে পা নেড়ে চটিজুটো ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিল। ঘুর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। একপলক সে তাকিয়েছিল তৃণার দিকে, তাতে চোখে একটু বুঝি বিস্ময়, আর একটু ঘৃণা। বাদবাকি ব্যবহারটা উপেক্ষার।

পরনে একটা কমলারঙের হালফ্যাশনের ফ্রক। রোগা হলেও রেবা বেশ লম্বা। গায়ে মাংস লাগলে একদিন ফিগারটা ভালই দেখাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের একটা ব্রণ টিপল। আঙুল দিয়ে ঘষল জায়গাটা।

বলল—কি বলতে এসেছো ?

একটু চমকে উঠল তৃণা। এ ঘরে সে যে অনধিকারী তা মনে

পড়ল। বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, সে তো আর পালাতে পারে না এখন। আস্তে করে বলল—তোর আজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে!

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে রেবা উত্তর দেয়—এ সময়েই ছুটি হয়। তাড়াতাড়ি আবার কী?

বলে আয়নায় মুখ দেখতে থাকে। আয়নার ভিতর দিয়েই বোধ হয় তৃণাকে এক-আধ পলক দেখে নিল। কিন্তু তৃণার সেদিকে তাকাতে সাহসই হল না। অপরাধীর মতো মুখ নীচু রেখে বলে—তুই কি ছবি আঁকিস রেবু?

রেবা একটু অবাক হয় বোধ হয়। বলে—হ্যাঁ আঁকি।

—জানতাম না তো।

—ক্লাসে আমাদের ড্রইং শেখায়। এ সবাই জানে।

—কবিতা পড়িস?

—পড়ি।

তৃণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

রেবা একটু ঝাঁজ দিয়ে বলে—আর কী বলবে?

—কিছু না।

—আমার এখন অনেক কাজ আছে। পোশাক ছাড়ব। তুমি যাও।

—যাচ্ছি। তৃণা উঠে দাঁড়ায়। কোনো বয়সের মেয়েই মায়ের সামনে পোশাক ছাড়তে লজ্জা পায় না। তবু তৃণা সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। এই ঘরে তার উপস্থিতির কোনো জরুরী অজুহাত খুঁজে না পেয়ে দুর্বল গলায় বলে—তুই নতুন কী রেকর্ড কিনলি দেখতে এসেছিলাম।

রেবা উত্তর দিল না। আয়নায় মুখ দেখতে থাকল।

তৃণা একটু শুকনো গলায় বলে—তোর ওয়ার্ডরোবে শাড়ি দেখছিলাম। পরিস না কি?

—ইচ্ছে হলে পরি। তুমি যাও।

—যাচ্ছি। আমার তো অনেক শাড়ি। তুই নিবি ?

—না।

—কেন ?

—আমার অনেক আছে। দরকার হলে বাপি আরো কিনে দেবে।

তৃণা শ্বাস ছেড়ে আপন মনে ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়ে। এ সত্য তার জানা। প্রয়োজন হলে শচীন রেবাকে বাজারসুদ্ধ শাড়ি কিনে এনে দেবে। রেবা নিজে গিয়েও কিনে আনতে পারে বাজার ঘুরে, পছন্দ মতো। তবু বাঙালী ঘরের রেওয়াজ, বয়স হলে মেয়েরা মায়ের শাড়ি পরে। সেটা শাড়ির অভাবের জন্য নয়। নিজের শাড়ি পরিয়ে মা মেয়েকে দেখে। মুখ টিপে মনে মনে হাসে। মায়েরা ঐ ভাবেই আবার জন্মায় মেয়ের মধ্যে। কিন্তু রেবার তা দরকার নেই।

মুখশোষ টের পায় তৃণা। হাতে পায়ে শীত, মাথা গরম, শ্বাস গরম। দু-পা হেঁটে যায় দরজার দিকে। একটু দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় একবার। তার ভ্রু কোঁচকানো, চোখে বিশুষ্ক কান্না। ঐ গুয়ের গ্যাংলা মেয়েটা কত সহজে তার মা-পনা ঘুচিয়ে দেয়।

এ বাড়িতে দুটো ভাগ আছে। একদিকে তৃণা একা, অন্যদিকে শচীন, মনু আর রেবা! সিণ্ডিকেট, ঘরগুলোর মাঝখানে যোজন-যোজন ব্যবধান পড়ে থাকে সারাদিন। তার পক্ষে কেউ নয়। তবু ওর মধ্যে কি মনু একটু মায়ের টান টের পায় ? অনেকদিন ভেবেছে তৃণা। ঠিক বুঝতে পারে না। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধবার মা বলে ডেকে ফেলে মনু। হয়তো কোনো কথা বলে ফেলে। খেতে বসে হয়তো এটা-ওটা চায়। তড়িঘড়ি এগিয়ে দেয় তৃণা। মনু কখনো কিছু বললে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করে, তাই দেয়। কিন্তু বুকে এত কাঙালপনা নিয়েও তৃণা জানে, মনুর আসলে টান নেই।

ও সোজা সরল ছেলে, দিনরাত খেলার কথা ভাবে, মাকে নিরন্তর ঘৃণা করার কথা মনে রাখতে পারে না। অন্যমনস্কতাবশত ভুলে যায়। একটু আগে কেমন স্মিতমুখে বলেছিল—চ্যানেল সিক্স না?

রেবার কখনো ভুল হয় না। নিরন্তর বুকে সাপের মতো পুষে রাখে উপেক্ষা আর ঘেন্না। কখনো তা থেকে অন্যমনস্ক হয় না রেবা। বয়স মোটে বারো বছর, এখনো ঋতুমতী নয় বোধ হয়, তবু কেমন সব গোপন করে রেখেছ মায়ের কাছে। কেমন স্বাধীন, ডাকাবুকো।

তৃণা যাই যাই করেও খানিক দাঁড়ায়, বলে—আমার লকারে গাদা গয়না পড়ে আছে। পাঠিয়ে দেবোখন, পরিস।

—কে চেয়েছে?

—চাইতে হবে কেন? ও তো তোর পাওনা!

—আমি গয়না পরি না! তার ওপর সোনার গয়না! মাগো! বলে ঠোঁট মুখের একটা উৎকট ভঙ্গি করে রেবা।

তৃণা হ্যাংলার মতো হাসে। বলে—তা অবিশ্যি ঠিক। সলিড সোনার গয়না তোদের বয়সীরা আজকাল কেউ পরে না। বরং ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিস।

—আমি পরব না। তুমি পরো।

—তুই তো একরত্তি মেয়ে, ঐ রোগা শরীরে আর কখানা গয়নাই বা ধরবে। আমার অনেক আছে। তোকে দিয়েও থাকবে। তোরই তো সব।

—তোমার কিছুই আমার নয়। না পরলে বিলিয়ে দিও।

—কেন, পরবি না কেন?

—ইচ্ছে। শাড়ি গয়নার কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। তুমি এখন যাও।

ভুল অস্ত্র। কিন্তু এ ঠিক তৃণার দিক থেকে লোভ দেখানো নয়। কিছুক্ষণ রেবার ঘরে থাকার জন্য এ হচ্ছে এলোপাথাড়ি কথা কওয়া,

নইলে সে জানে, রেবার কিছু অভাব নেই। এখনকার মেয়েরা শাড়ি গয়নার নামে ঢলে পড়ে না।

রেবা খাটের অন্যধারে বসে পা দোলায়। পায়ের আঙুলের রুপোর চুটকিতে ঝুনঝুন শব্দ হয় একটু। খুব অবহেলার অনায়াস ভঙ্গি। তৃণার বারো বছর বয়সটা কেটেছে বিছানায়। ঐ সময়ে এত সতেজ, প্রাপ্তবয়স্কতার ভাবভঙ্গি তার ছিল না। ঐ বয়সে ছিল কত ভয়, সংশয়, কত আত্ম-অবিশ্বাস! তবু তৃণা মনে মনে একরকম খুশীই হয়। মেয়েটা তার মতো হবে বোধ হচ্ছে। ছবি আঁকে, কবিতা পড়ে, শাড়ি গয়নার দিকে মন নেই।

ও ঘরের বাথরুম থেকে মন্নুর সুরহীন হিন্দী গান শোনা যায়। তার সঙ্গে জলের প্রবল শব্দ। সেই জলশব্দে তেষ্টা পায় তৃণার। আসলে বুকটা কাঠ হয়েই ছিল। জলের কথা খেয়াল হচ্ছিল না তার।

ভিখিরির মতো তৃণা বলে—একটু জল খাওয়াবি রেবু?

রেবা ভীষণ বিরক্ত হয়। তার রোগা, তিরতিরে বুদ্ধির মুখখানায় কোন মুখোশ নেই। সহজেই রাগ, বিরক্তি, অভিমান বোঝা যায়। ভ্রূ, নাক, চোখ কুঁচকে উঠল। তবু পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দেয়ালে পিয়ানো রিডের মতো একটা সুইচ টিপে ধরল।

ঠিন ঠিন করে গোটা দুই সুরেলা আওয়াজ হল ভিতরে। অমনি ঝি দুর্গার মা এসে দাঁড়ায় দরজায়, নীরবে।

রেবা বলে—এক গ্লাস জল।

এরকমই হওয়ার কথা। রেবা নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবে না, এ কি জানত না তৃণা?

দুর্গার মা হলঘরের কুলার থেকে ঠাণ্ডা জল এনে দিল। ট্রের ওপর স্বচ্ছ কাটগ্লাসের পাত্র, ওপরে একটা কাচের ঢাকনা। জলটা হীরের মত জ্বলছে। তৃণা সবটুকু খেয়ে নিল।

রেবা বলে, এবার হয়েছে? এখন যাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণা ভাল মেয়ের মতো বলে—এই খাড়া দুপুরে আবার বেরোবি নাকি ?

—বেবোলেই বা !

—কোথায় যাবি ?

– কাজ আছে।

– তুই যে কবিতার বইগুলো কিনেছিস ওগুলোর সব আমার নেই। এক-আধখানা দিস তো, পড়ব।

রেবা উত্তর দিল না। ওয়ার্ডরোব থেকে পছন্দমতো পোশাক বের করতে লাগল। একটা লুঙ্গি আর কামিজ বের করে সাজাল বিছানার ওপর। বিশুদ্ধ সিল্কের হালকা জামরঙের লুঙ্গি। সোনালি সিল্কের ওপর ছুঁচের কাজ করা কামিজ।

—বাঃ ভারী সুন্দর তো !

—কী সুন্দর ? ঝামরে ওঠে রেবা।

—পোশাকটা। কবে করালি ?

রেবা তার পাতলা ধারাল মুখখানা তুলে তৃণাকে এক পলকের কিছু বেশি লক্ষ্য করল। তৃণা চোখ সরিয়ে নেয়।

রেবা বলে—তুমি যেখানে যাচ্ছো যাও।

তৃণা হ্যাংলার মতো তবু বলে—বড্ড বোদ উঠেছে আজ। ছাতা নিবি না ?

—সে আমি বুঝব।

—রেবু, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

—ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—তুই অমন করছিস কেন ?

রেবা উত্তর না দিয়ে তার ঘরের লাগোয়া নিজস্ব বাথরুমে চলে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

ফাঁকা ঘরে একা তৃণা দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই তার শরীর খারাপ লাগছিল। খুব খারাপ, যেন বা গা ভরে জ্বর এসেছে।

চোখে জ্বালা, হাত পা কিছুই যেন বা তার বশে নেই। আর মাথার মধ্যে চিন্তার রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা টের পায় সে। পূর্বাপর কোনো কথাই সাজিয়ে ভাবতে পারে না।

শরীরটা কাঁপছিল, খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে তৃণা। হলঘরে হাল্কা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। একটু দাঁড়ায়, তারপর অবশ হয়ে দেয়ালের গায়ে লাগানো নরম কৌচটায় বসে পড়ে। কৌচের পাশে মস্ত রঙীন কাঠের বাক্সে লাগানো পাতাবাহারের গাছের পাতা তার গাল স্পর্শ করে।

ঝিম মেরে একটুক্ষণ বসে থাকে তৃণা। কতকাল সে তার শরীরের কোনো খোঁজ রাখে না, ভিতরে ভিতরে কী অসুখ তৈরী হয়েছে কে জানে! মাথাটা ঠিক রাখতে পারছে না সে। স্খলিত হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি, পারম্পর্যহীন সব এলোমেলো কথা ভেসে আসছে মনে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে খুব।

একটা তীব্র শিসের শব্দে সে মুখ তোলে। গায়ে ব্যানলনের দুধসাদা গেঞ্জি, পরনে পাতিলেবুর রঙের স্ট্রেচলনের বেলবটম পরা মন্নু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ডান হাতের ব্রেসলেটে ঢিলা করে পরা ঘড়িটা দেখল। সময়টা বিশ্বাস হল না বুঝি। ঘড়িটা কানের কাছে তুলে শব্দ শুনল। তারপর তৃণাকে লক্ষ্য না করেই আবার চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে।

পাতাবাহারের আড়াল থেকে মন্নুর সুন্দর চেহারাটা দেখে তৃণা। এই বয়সেই মন্নু মোটর চালায়, টেনিস খেলে, বিদেশী নাচ শেখে। তৃণার জগৎ থেকে অনেক দূরে ওর বসবাস। বড়সড় স্বাস্থ্যবান ঐ ছেলেটা যে তার গর্ভজ সন্তান তা তৃণার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হলেও এক এক সময়ে বড় ভয় করে, এক এক সময়ে অহংকার হয়। কিন্তু এও সত্যি কথা, মন্নুর জগতে তৃণা বলে কেউ নেই।

সিঁড়ির মাথায় চলে গিয়েছিল মন্নু। এক্ষুনি নেমে যাবে।

তৃণার গলায় একটুও জোর ফুটল না। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল—মন্নু!

ডাকটা মন্নুর শোনার কথা নয়। মস্ত হলঘরটার অন্য প্রান্তে

চলে গেছে সে। তার ওপর শিসে একটা গরম হিন্দী টিউন তুলছে। তা ছাড়া যৌবনবয়সের চিন্তা আছে, আর আছে ঘরের বাইরে জগতের আনন্দময় ডাক। মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ তার শোনার কথা নয়। তবু দ্রুত দু ধাপ সিঁড়ি চঞ্চল পায়ে নেমে গিয়েও দাঁড়াল সে! একটু এপাশ ওপাশ তাকাল। হয়তো ক্ষীণ সন্দেহ হয়ে থাকবে যে কেউ ডেকেছে।

পাতাবাহারের আড়ালে মুখখানা ঢেকে তৃণা তেমনি ক্ষীণ গলায় বলে—মনু, আমি এখানে।

এবার মনু শুনতে পায়। ফিরে তাকায়। মুখে একটু ভ্যাবলা অবাক ভাব। শরীরটা যত বড়ই হোক, ওর বয়সে এখনো ছেলেরা মায়ের আঁচলধরা থাকে।

মনু তাকে দূর থেকে দেখল। রাঙা শাড়ি পরেছে তৃণা, মেখেছে দামী বিদেশী সুগন্ধ, আর নানা রূপটান। নষ্ট মেয়ের সাজ। একটু আগে বাড়িতে ঢোকার সময়ে তাই কি ঠাট্টা করে মনু বলেছিল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স, না? নষ্টামিটা কি তৃণার শরীরে খুব স্পষ্ট হয়ে আছে?

মনু সিঁড়ির দুধাপ উঠে আসে। হলঘরটা লম্বা পদক্ষেপে পার হয়ে সামনে দাঁড়ায়। মুখে একটা গা-জ্বালানো ঠাট্টার হাসি। হাল্কা গলায় বলে—আরে! তুমি তো বেরিয়ে গেলে দেখলাম!

তৃণা তৃষিত মুখখানা তুলে ওকে দেখে। কী বিরাট, কী প্রকাণ্ড সব মানুষ এরা।

মাথা নেড়ে তৃণা বলে—যাইনি।

—যাওনি তো দেখতেই পাচ্ছি। কী ব্যাপার?

—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—বেরোচ্ছি।

—আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

শুনে মনুর মুখে খুব সামান্য, হাল্কা জলের মতো একটু উদ্বেগ খেলা করে গেল কি? বলল—শরীর খারাপ তো শুয়ে থাকো।

মন্নুব মুখখানা অবিকল তৃণার মতো। মাতৃমুখী ছেলে! ওর চোখে একটা মেয়েলি নম্রতা আছে। এ সবই তৃণার চিহ্ন। মন্নুর মুখে চোখে তৃণার চিহ্ন ছড়ানো আছে। অনেকদিন বাদে একটু লক্ষ্য করে তৃণা খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে।

মন্নু একটু ঝুঁকে তাকে দেখে নিয়ে বলে—খুব সেজেছো দেখছি! তবু তোমাকে খুব পেল্ দেখাচ্ছে। চোখও লাল। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—আমাকে একটু ধরে ধরে নিয়ে যাবি?

—এসো। বলে সঙ্গে সঙ্গে মন্নু হাত বাড়ায়।

ভারী অবাক মানে তৃণা, ও কি তাকে ছোবে? ঘেন্না করবে না ওব? তৃণা সঙ্কুচিত হয়ে বলে—তোর দেরি হচ্ছে না তো!

—হচ্ছে তো কি? এসো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই ঘরে।

তৃণা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে চমকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মন্নু তাকে এক ঝট্‌কায় পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে হেসে বলে—আরে! তুমি তো ভীষণ হাল্কা!

তৃণার মাথা ঘুরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। সে ককিয়ে কান্না গলায় বলে—ছেড়ে দে, ওরে!

—তুমি কি ভাবছ তোমাকে নিতে পারব না?

—ফেলে দিবি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে তৃণা।

—দূর! আমি ওয়েটলিফটার, জানো না? তুমি তো মশার মতো হাল্কা। বলে দুহাতে তৃণার শরীরটা ওপরে নীচে একবার দুলিয়ে দেখায় মন্নু। তৃণা তখন ছেলের শরীরের সুঘ্রাণটি পায়। মৃদু সাবান পাউডার, আর জামাকাপড়ে ওয়ার্ডরোবের পোকা-তাড়ানো ওষধের গন্ধ। এসব ভেদ করে মন্নুর গায়ের রক্তমাংসের একটা গন্ধ, একটা স্পন্দন পায় না কি সে?

অনায়াসে মন্নু হলঘরটা পার হয়ে যায় তৃণাকে পাঁজাকোলে নিয়ে। তৃণা ভয়ে চোখ বুজে ছিল, মুঠো হাতে খামচে ধরে ছিল মন্নুর গেঞ্জির বুকের কাছটা।

নরম বিছানায় মনু তৃণাকে ঝুপ করে নামিয়ে দিয়ে হাসে—দেখলে তো ?

তৃণা একটু ক্ষীণ হেসে বলে—নিজের শরীরে অত নজর দিস না। নিজের নজর সবচেয়ে বেশি লাগে।

—সবাই আমাকে নজর দেয়। বন্ধুরা আমাকে স্যামসন বলে ডাকে।

—বালাই ষাট।

মনু ঠাট্টার হাল্কা এবং বোকাহাসি হাসে। বলে—চলি।

—কোথায় যাবি ?

—যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

মনু মাথা ঝাঁকায়। দরজার কাছ থেকে একবার সাহেবী কায়দায় হাতটা তোলে। চলে যায়।

মনুর শরীরের সুঘ্রাণ এখনো ভরে আছে তৃণার শ্বাসপ্রশ্বাসে। ছোটো থেকেই মনু মোটাসোটা ভারী ছেলে, টেনে ওকে কোলে তুলতে কষ্ট হত। তখন থেকে সবাই ছেলেটাকে নজর দেয়। এখন দেখনসই চেহারা হচ্ছে। পাঁচজনে তাকাবেই তো! ভাবতে এক রকম ভালই লাগে তৃণার। দুঃখ এই যে, ছেলে তার হয়েও তার নয়। একটু বুঝি বা কখনো মনের ভুলে মাকে মা বলে মনে করে। তারপরই আবার আল্‌গা দেয়। দূরের লোক হয়ে যায় সব। তৃণা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কত রকম যে ভয় তার! সে চুপ করে শুয়ে মনুর কথা ভাবতে থাকে।

শচীন কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এল। পাশের ঘর থেকে তার সুরহীন গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি আসে। হলঘরে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ঘোরের মধ্যে শুয়ে থেকে সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনে তৃণা। শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠে বসল, এগারোটা না ?

বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ করে। উত্তেজনায় নয়। হঠাৎ উঠে বসায় বুকে একটা চাপ লেগেছে। বাসস্টপটা খুব দূরে নয়। দেবাশিস

এসে অপেক্ষা করবে। নিজের মানুষ-জনের কাছে বড্ড পুরো হয়ে গেছে তৃণা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে এমন কাউকে চাই যা কাছে প্রতিদিন তৃণার জন্ম হয়।

সে উঠল। শরীর ভাল নেই। মন ভাল নেই। এই ভরদুপুরে সে যদি বেরিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ফিরে না আসে তবু কারো কোনো উদ্বেগ থাকবে না। কেউ একফোঁটা চিন্তা করবে না তৃণার জন্য।

হলঘর থেকে রেবার উচ্চকিত স্বর পাওয়া গেল—বাপি!

শচীন গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়—হুঁ!

—আমি বেরোচ্ছি।

—আচ্ছা।

শচীন তার দাঁড়ে সব পাখিকে শেকল পরাতে পেরেছে। এ সংসারে তৃণার মত পরাজিত কেউ না। শচীন একই সঙ্গে ছেলেমেয়ের মা ও বাবা, ওরা কোথায় যায় কী করে তা তৃণার জানা নেই। যেমন, আজ দুপুরে কে কে বাড়িতে খাবে, বা কার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে, তা সে জানে না। কেউ বলে না কিছু। যা বলে তা শচীনকে। একা, অভিমানে তৃণার ঠোঁট ফোলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার কোঁচকানো শাড়িটা ঠিকঠাক করে নেয়, বেরোবে।

বেরোবার মুখে সে হলঘর পেরোতে গিয়ে দেখে শচীন টবে গাছগুলি ঝুঁকে দেখছে। তৃণার দিকে পিছন ফেরানো। চল্লিশের কিছু ওপরে ওর বয়স, স্বাস্থ্য ভাল। তবু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে একজন বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। কিছু ধীরস্থির, চিন্তামগ্ন বিবেচকের মতো দেখতে, পাকা সংসারীর ছাপ চেহারায়।

তৃণা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল। শচীনের টের পাওয়ার কথা নয়। তবু শচীন টের পেল। হঠাৎ ঝুঁকে কী একটা তুলে নিয়ে ফিরে সোজা তার দিকে তাকাল। হাতে একটা ছোট্ট রুমাল। তৃণার।

শচীন জিজ্ঞেস করে—এটা তোমার?

খুব সূক্ষ্ম কাপড় আর লেস্ দিয়ে তৈরী রুমালটা তারই। সোফায় বসে থাকার সময়ে পড়ে গিয়ে থাকবে।

তৃণা মাথা নাড়ল।

—এখানে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল। বলে শচীন রুমালটা সোফার ওপর আল্‌তোভাবে রেখে দিয়ে আবার গাছ দেখতে লাগল। জাপান থেকে বেঁটে গাছ আনাচ্ছে, শুনেছে তৃণা! সে গাছ কাচের বাক্সে হলঘরে রাখা হবে। বোধ হয় সে ব্যাপারেই কোন প্ল্যান করছে।

রুমালটা তুলে নিতে গিয়ে তৃণাকে শচীনের খুব কাছে চলে যেতে হল। তার শ্বাস প্রশ্বাস গায়ের গন্ধ ও উত্তাপের পরিমণ্ডলির ভিতরেই বোধ হয় চলে যেতে হল তাকে। তৃণা নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ টের পায়। অবশ্য শচীন খুবই অন্যমনস্ক। সে মোটে লক্ষ্যই করল না তাকে।

তৃণা রুমালটা তুলে নিল। চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ দাঁড়াল, তার কিছু হারাবার ভয় নেই, কিছু পাওয়ার আশাও নেই, তাহলে রেবা আর মনুর পর এ লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? বেশ কিছুদিন আগে শচীন তাকে মেরেছিল। জীবনে ঐ একবারই বোধ হয় পদস্খলন হয়ে থাকবে লোকটার। তা ছাড়া আর কখনো তৃণার জন্য বোধ হয় কোনো আবেগ বোধ করে নি। শচীনের ঐ মারটা একটা সুখস্মৃতির মতো কেন যে।

তৃণা অচমকা বলে—আমি যাচ্ছি।

শচীন শুনতে পেল না।

তৃণা মরীয়া হয়ে বলে—শুনছো!

অন্যমনস্ক শচীন দীর্ঘ উত্তর দেয়—উঁ…উঁ!

তারপর ধীরে ফিরে তাকায়। সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে লগ্ন চোখ।

—আমি একটু বেরোচ্ছি। তৃণা হাঁফধরা গলায় বলে।

শচীন বড় অবাক হয় বুঝি!' বিস্ফারিত চোখে তার রাঙা পোশাকপরা চেহারাটা দেখে। অনেকক্ষণ পরে বলে—ওঃ!

শচীনের উত্তেজনা কম, রাগ কম। কিন্তু একরকমের কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠার বর্ম পরে থাকে। স্ত্রী বিপথগামিনী বলে তার মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু তা প্রকাশ করা তার রেওয়াজ নয়, এমন কি তৃণাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলেও দেয়নি, চমৎকাব সুখ-সুবিধের মধ্যে রেখে দিয়েছে। লোকলজ্জাকেও গায়ে মাখে না। এ কেমনতর লোক? এমন হতে পারে, তৃণাকে ভালবাসে না, কখনো বাসে নি। কিন্তু ভালবাসুক চাই না বাসুক, পুরুষেব অধিকারবোধও কি থাকতে নেই? কিংবা আত্মসম্মানবোধ? তৃণাব শরীব ভাল নয়, মাথার ভিতরটাও আজ গোলমেলে। নইলে সে এমন কাণ্ড করতে সাহসই পেত না। সে তো জানে, শচীনের তাকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে কোথায় যায় বা না যায় তাব খোঁজ কখনো রাখে না।

তৃণা খুব অসম্ভব একটা চেষ্টায় শচীনের ওপর নিজের চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শচীন খুব গম্ভীর। অন্যমনস্কতা কেটে গেছে; একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে মাত্র।

শচীন মাথাটা নেড়ে বলল - যাবে যাও। বলার কী?

এই উত্তরই আশা করেছিল তৃণা। কিন্তু আজ তার একটা মরীয়া ভাব এসেছে। কেবলই মনে হয়েছে টানবাঁধা, উদ্বেগ ও শঙ্কায় ভরা এইসব সম্পর্কের ভিতবের সত্যটা তার জেনে নেওয়া দরকার। যেন আর খুব বেশি সময় নেই।

তাই তৃণা বলে—এ ছাড়া তোমার আর কিছু বলার নেই?

শচীন অবাক হয়ে বলে—কী থাকবে? এখন বলা-কওয়ার স্টেজ পার হয়ে গেছে।

তৃণা তার শুকনো ঠোঁট বিশুষ্ক দাঁতে চেপে ধরল। মুখে জল নেই, পাপোষের মতো খসখসে লাগছে জিভটা। কিন্তু আশ্চর্য যে বহুদিন পরে শচীনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বুক কাঁপছে না, ভয়ও হচ্ছে না তেমন।

তৃণা বলে—আমি যদি একেবারে চলে যাই তাহলেও কিছু বলার নেই ?

—বলার অনেক কিছু মনে হয়। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে না।

—কেন ?

—বলা মানে কাউকে শোনানো, আমার তো শোনানোর কেউ নেই!

তৃণা চুপ করে থাকে। কান্না আসে, কিন্তু কাঁদে না। তার কান্নার মূল্যই বা কী ?

শচীন টেবিল থেকে জলের জগটা তুলে নিয়ে আলগা করে একটু জল খেল। তারপর তৃণার দিকে তাকিয়ে তেমনি চিন্তিত গলায় বলে—তুমি কী একেবারেই যাচ্ছো ?

তৃণা কিছু বলল না। দুঃসাহসভরে তাকিয়ে থাকল।

শচীন বলে—এ সিদ্ধান্তটা আরো আগেই নিতে পারতে।

—তাহলে কী হত ?

—তাহলে অন্তত উদ্বেগ আর মানসিক কষ্ট হত না। দেবাশিসবাবুও নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তৃণা অধৈর্য হয়ে বলে—আমি সে-যাওয়ার কথা বলিনি।

—তবে ?

—আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।

—ও। শচীন একটু চুপ করে থাকে। তারপর, যেন বুঝেছে, এমনভাবে মাথা নাড়ল। বলল – তাও মনে হওয়া সম্ভব। বহুকাল ধরেই তোমার নার্ভের ওপর চাপ যাচ্ছে। তার ওপর আছে নিজেকে ক্রমাগত অপরাধী ভেবে যাওয়ার হীনমন্যতা। এ অবস্থায় মরতে অনেকেই চাইবে।

—তুমি কি সিমপ্যাথি দেখাচ্ছ ?

—না। কিন্তু তোমাকে সাহসী হতে বলছি। চোরের মতো বেঁচে আছো কেন ? যা করেছো তা আরো সাহস আর স্পষ্টতার সঙ্গে করা উচিত ছিল।

—কী বলতে চাও তা আরো স্পষ্ট করে বলো।

শচীন তার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল, যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না তৃণার এই ব্যবহার। তারপর বলে—এ ঘরটা কথা বলার ঠিক জায়গা নয়। এসো।

বলে শচীন হলঘরের সামনের দিকের ঘরটায় ঢোকে। এই ঘরে পাতা রয়েছে সবুজ রঙের পিঙপঙ টেবিল, ক্যারম, দাবা, দেয়ালে সাজানো টেনিস আর ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট। কাঠের ফ্রেমে গল্‌ফ্‌ কীট। একধারে জুতোর র‍্যাক, দেয়ালআলমারিতে সাজানো কয়েকটা বন্দুক, রাইফেল, কয়েকটা ভাল সোফা দেয়ালের সঙ্গে পাতা রয়েছে।

তৃণার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, শচীন তার সঙ্গে কথা বলার জন্য একটুও আগ্রহ দেখাবে। ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। কিন্তু এও জানে তৃণা, কথা বলে এ সমস্যার কোনো সুরাহা হওয়ার নয়!

ঘরটা একটু আবছায়া। শচীন ঢুকে তৃণার ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিঙপঙ খেলার জন্য এ-ঘরে কয়েকটা খুব বেশি পাওয়ারের আলো লাগানো আছে। শচীন আলো জ্বালে। চোখ ধাঁধানো আলো।

তৃণার মাথার মধ্যে একটা বিকারের ভাব। বন্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার মনে হয়, এ ঘরে একটা মিলনান্তক নাটক করার জন্যই শচীন তাকে ডেকে এনেছে। শেষমেশ জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরবে না তো! না, না তাহলে সহ্য করতে পারবে না তৃণা। বড় বিতৃষ্ণা হবে তাহলে।

শচীন পিঙপঙ টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার টেনে বসল, টেবিলের ওপরে সাবধানে নিজের হাত দু'খানার ভর রেখে তৃণার দিকে চেয়ে বলল—এবার বলো।

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমি কী বলব?

—বলাটা তুমিই শুরু করেছো।

তৃণা একটু থমকে থাকে। সময় চলে যাচ্ছে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে দেবাশিস তার গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকবে। সেটা ভাবতেই তার শরীরে অসুস্থতাকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা জোয়ার আসে তীব্র, তীক্ষ্ণ আনন্দের! শচীনের দিকে তাকিয়ে তার এ লোকটার সঙ্গ করতে অনিচ্ছা হতে থাকে।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—আমি বোধ হয় বেশিদিন বাঁচব না।

—সেটা হঠাৎ আজ বলছ কেন?

—আজ বলছি, আজই মনে হচ্ছে বলে।

শচীন মাথা নেড়ে ধীর স্বরে বলে—যদি মনে হয় তাহলে তার জন্য আমরা কী করতে পারি?

তৃণা অধৈর্যের গলায় বলে—আমি কিছু করতে বলিনি।

—তবে?

তৃণা একটু ভাবে। ঠিকঠাক কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ বলে—আমি এ বাড়িতে কী-রকমভাবে আছি তা কি তুমি জানো না?

শচীন চুপ করে চেয়ে রইল খানিক। তৃণার আজকের সাহসটা বোধহয় তারিফ করল মনে মনে।

তারপর বলল—বাইরে থেকে কেমন আছো তা জানি। কিন্তু মনের ভিতরে কেমন আছো তা কী করে জানব? প্রত্যেক মানুষই দুটো মানুষ।

—সে কেমন?

—বাইরেরটা আচার আচরণ করে, সহবৎ রক্ষা করে, হাসে বা কাঁদে, ভালবাসে বা ঘেন্না করে; আর ভিতরের মানুষটা এক পাগল। বাইরের জনের সঙ্গে তার মিলমিশ নেই, বনিবনা নেই, একটা আপস-রফা হয়তো আছে। সেই ভিতরের মানুষটাকে জেনুইন অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারে না!

—আমি তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।

শচীনকে খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছে। এ মানুষটার এই শান্তভাবটা তৃণা কখনো ভাল মনে নিতে পারে না। শচীন শান্তমুখে বলে---তত্ত্বকথা মানেই তো আর পুঁথিপত্রের কথা নয়। জীবন থেকেই তত্ত্ব কিংবা দর্শন আসে। আমি তো স্পষ্ট করেই বলছি যে. তোমাব জন্য আমরা কিছু আর করতে পারি না।

—তা জানি। আমি তবু একটা কথা জানতে চাই। তোমাব চোখে এখন আমি কীরকম ?

শচীন হাসল না। তবু একটু দুর্বোধ্য কৌতুক চিকমিক করে গেল তার চোখে। বলল--অ্যাপারেন্ট্‌লি তুমি তো এখনো বেশ সুন্দরীই। ফিগাব ভাল. ছেলেমেয়েব মা বলে বোঝা যায় না।

তৃণা রেগে লাল হয়ে গেল। বলল—সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।

—তবে ?

—আমি জানতে চাইছি, তুমি আমাকে কী চোখে দেখ !

—ও : বলে শচীন তেমনি চুপ করে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখে কোনো ভাষা নেই, নীরব কৌতুক ছাড়া। বলে—তোমাকে আসলে আমি দেখিই না। অনেক চেষ্টা করে তবে এই না-দেখার অভ্যাস করেছি।

তৃণার এ সবই জানা। তবু বলল—এই যেমন এখন দেখছ! এখন কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না ?

—হচ্ছে।

—সেটা কেমন ?

—রাস্তার ভিখিরিদের আমরা লক্ষ্য করি না। আবার তাদের মধ্যে কেউ যখন সাহসী হয়ে. কিংবা মরীয়া হয়ে কাছে এসে তাদের দুঃখের কথা বলে তখন তাকে দেখি, মায়া হয়, করুণা বোধ করি। এও ঠিক তেমনি, তোমার জন্য মায়া এবং করুণা হচ্ছে। আবার যখন ভিখিরিটা দঙ্গলে মিশে যাবে, তখন আবার তাকে লক্ষ্য করব না। আমরা কেউ কাউকে কনস্ট্যান্ট মনে রাখতে পারি না, সে যত

ভালবাসার বা ঘেন্নার লোক হোক না কেন। কখনো মনে রাখি, আবার ভুলে যাই, ফের মনে করি—এমনিভাবেই সম্পর্ক রাখি। মানুষ দুভাবে থাকে।

—সে কেমন?

—এক, কেবলমাত্র শারীরিকভাবে থাকে। দুই, মানুষের মনের মধ্যে থাকে। আমার কাছে, তুমি কেবল শারীরিকভাবে আছো, আমার মনের মধ্যে নেই।

তৃণা ভ্রু কোঁচকায়। বিরক্তিতে নয়, যখন সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে তখন ভ্রু কোঁচকানো তার স্বভাব।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—এটা সত্যি কথা নয়।

—তাহলে কোনটা সত্যি কথা? তুমি কি আমার মনের মধ্যে আছো?

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—আমি সে কথা বলিনি। আমি জানতে চাই আমাকে---আমার প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কী?

শচীন মাথাটা নামিয়ে সবুজ টেবিলটার ওপর তার দুহাতের আঙুল দেখল। তারপর মুখ না তুলেই বলল—আমি খুব সিমপ্যাথেটিক। তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি, তাই তোমাকে সাহসী হতে বলেছিলাম।

—আমাকে চলে যেতে বলছো?

শচীন মাথা নেড়ে বলল—না, তুমি এ বাড়িতে থেকেও যা খুশি করতে পারো। তাতে আমাদের যে কিছু আসে যায় না তা তো তুমি বোঝোই, কিন্তু তোমার তাতে আসে যায়। তুমি কেবলই পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছো, আমরা তোমাকে নিয়ে নানা জল্পনা করছি বলে সন্দেহ করছ। হয়তো একথাও ভাবো যে, দেবাশিসবাবুর স্ত্রী তোমার জন্যই আত্মহত্যা করেন। এসব তোমার ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি না, কিন্তু গেলে তোমার দিক থেকেই ভাল হবে।

– আমি থাকি বা যাই, তাতে কি তোমাদের কিছু যায় আসে না ?

- না।

– আর যদি মরে যাই ?

– সেটা স্বতন্ত্র কথা ! অন্য মানুষকে মরতে দেখলে আমাদের নিজের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, তাই মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু, তুমি মরবে কেন ?

– আমি ইচ্ছে করে মরব, এমন কথা বলিনি। কিন্তু মনে হয়, আমি আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—তাহলে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। যাতে মরতে না হয় এমন কিছু করাই ভাল! শরীর খারাপ হয়ে থাকলে ডাক্তার দেখাও।

তৃণা ঘুরে দরজার দিকে এগোয়। ছিটকিনি খুলতে হাত বাড়িয়ে বলে—দেখাবো। কিন্তু দয়া করে মনে কোরো না যে, আমি তোমার বা তোমাদের করুণা পাওয়ার জন্য মরার কথা বলেছিলাম।

শচীন চেয়ার ঠেলে উঠল। কথা বলল না।

তৃণা আর একবারও ফিরে তাকাল না। দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল হলঘরে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে বাগানের রাস্তা ধরে চলে আসে ফুটপাথে। খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলছিল তৃণা—যাবো না কেন ? আমি তো তেমাদের কেউ না।

কোনো লক্ষ্য স্থির ছিল না বলে তৃণা ভুল রাস্তায় এসে পড়ল। ঘড়িতে খুব বেশি সময় নেই। দেবাশিস আসবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে তাদের দেখা হবে। দেখা হলেই পৃথিবীর মরা রঙে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠবে।

তৃণা ঠিক করে ফেলল, আজ সে দেবাশিসকে বলবে, বরাবরের মতো চলে যাবে তৃণা, ওর কাছে।

সামনেই একটা থেমে-থাকা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে অল্পবয়সী একটা ছেলে। স্টার্টারে লাথি মারছে লাফিয়ে উঠে। স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটা, দু-একবার গরগর করে থেমে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাস্তায় শব্দটা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হয়ে মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দটায় যেন তৃণা সম্বিৎ ফিরে পেল। সে চারধারে তাকিয়ে দেখল, এ তার রাস্তা নয়। ফাঁড়ি আরো উত্তরে।

সে ঘুরে হাঁটতে থাকে। পিছনে মোটরসাইলেটা স্টার্ট নেয়, এবং ভয়ঙ্কর একটা শব্দ তুলে মুখ ঘুরিয়ে তেড়ে আসে। ফুটপাথে উঠে যায় তৃণা। মোটর সাইকেলটা ঝোড়ো শব্দ তুলে তাকে পেরিয়ে চলে যায়।

॥ পাঁচ ॥

গাড়ির শব্দ পেয়েই ওপর থেকে ফুলি হাঁফাতে হাঁফাতে নেমে আসে। অল্পবয়সেই ফুলি বড় মোটা হয়ে গেছে। একদঙ্গল ছেলেপুলের মা। তবু বোধ হয় সন্তানের তেষ্টা ওর মেটেনি। রবির জন্য একবুক ভালবাসা বয়ে বেড়ায়।

ফুলির আদর সোহাগ সবই সেকেলে ধাঁচের। রবি গাড়ি থেকে নামতে না-নামতেই ফুলি হাত বাড়িয়ে রাস্তাতেই ওকে বুকে টেনে নেয়। মৃদু সুখের ঘুনঘুনে শব্দ করতে করতে বলে—ধন আমার, মানিক আমার, গোপাল আমার……বলে মুখে বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। রবি প্রথমটায় লজ্জা পায়। হাত-পা দিয়ে আদরটা ঠেকায়। কিন্তু তারও দুর্বলতা আছে। সারা সপ্তাহ ধরে সে এই অদ্ভুত গ্রাম্য আদরটুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দেখা যায়, রবি দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে তার মণিমাকে, কাঁধে মাথা রেখেছে। বলছে—রোজ রাত্রে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখি মণিমা।

ফুলির বুকে বোধ হয় এই কথায় একটা ঢেউ ওঠে নতুন করে। সেই ঘুনঘুনে আদরেব শব্দটা করতে করতে পিষে ফেলে রবিকে। আর রবি এবার নির্লজ্জের মতো আদর খায়।

ফুলির ছেলেপুলেরা সাড়া পেয়ে হৈ-হৈ করে এসে ঘিরে ধরে রবিকে। রবি ওদের কাছে একটা বিরাট বিস্ময়। সে সাহেবদের মতো চমৎকার ইংরিজী বলে, অদ্ভুত সব দামী পোশাক পরে, নিখুঁত সহবৎ মেনে চলে! ফুলির ছেলেমেয়েরা এসব দেখে ভারী মজা পায়।

ফুলি তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রবিকে ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধচোখে একটু চেয়ে রইল, আপন মনেই বলল—রোগা হয়ে গেছে।

চাঁপা হটবক্স, ফ্লাস্ক আর দৈ-মিষ্টির ভাঁড় নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে—কিছু খেতে চায় না।

ফুলি মাথা নেড়ে বলে—খাবে কি? ওর ভিতরটা যে খাক হয়ে যায়। সে আমি বুঝি।

ফুলিদের আলাদা বসবার ঘর নেই। ঢুকতেই একটা লম্বাটে দরদালানের মতো আছে, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। ফুলির বর শিশির বি এন-আর-এ চাকরি করে। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভারী প্রাচীনপন্থী। বছর বছর ছেলেপুলে হয় বলে দেবাশিস ওকে একবার বলেছিল—ভায়া, বৌটাকে তো মেরে ফেলবে, ছেলে-পুলেগুলোও মানুষ হবে না।

শিশির একটু ঘাড় তেড়া করে বলল—তা কী করব বলুন?

তখন দেবাশিস বলে—কণ্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করো না কেন?

শুনে বড় রেগে গিয়েছিল শিশির, বলল—কেন, আমি কি নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি নাকি যে ওসব ব্যবহার করব?

এই হচ্ছে শিশির। আধুনিক জগতের কোনো খোঁজই সে রাখে না, তাব ধারণা চাঁদে মানুষ যাওয়ার ঘটনাটা স্রেফ কারসাজি আর পাবলিসিটি। আজও সে বিশ্বাস করে না যে চাঁদে মানুষ গেছে।

কথা উঠলেই বিজ্ঞের মতো একটা 'হুঁ' দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবাশিসকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেবাশিসের অর্থকরী সাফল্যকে সে হয়তো ঈর্ষা করে, কিংবা তার আধুনিক ফ্যাশানদুরস্ত হাবভাব, চালাক চতুর কথাবার্তা অপছন্দ করে।

দেবাশিস দরদালানের চেয়ারে বসল একটু। ভিতরের ঘরে রবিকে ঘিরে ধরে পিসতুতো ভাইবোন হল্লা করছে। মুর্গ-মুসল্লমের প্যাকেট হটবক্স থেকে বের করা হয়েছে বোধ হয়। তাই দেখে চেঁচাচ্ছে ফুলির আনন্দিত ছেলেমেয়েরা। বাথরুমের দিক থেকে গামছা-পরা শিশির বের হয়ে এল। দেবাশিসকে দেখে একটু হাসল। বলল—কী খবর? হাসিটা তেমন খুলল না।

—এই তো, চলে যাচ্ছে।

—রবিকে এনেছেন?

—হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছো না?

শিশির এবার সত্যিকারের হাসি হাসল। দেবাশিসকে যতই অপছন্দ করুক শিশির, রবির প্রতি তারও ভয়ঙ্কর টান আছে। রবি এলে সে রসগোল্লা কিনে আনে, টফি আনে, খেলনা আনে। ডাকে রবিরাজা বলে।

ফুলি এক কাপ চা হাতে এল। শিশিরকে দেখে ঘোমটা দিল মাথায়। ওর চালচলনে এখনই কেমন গিন্নি-বান্নির ঠাট-ঠমক পাকা হয়ে গেছে। একগাল পান মুখে।

চা-টা একটা ছোট্ট টুলে দেবাশিসের সামনে রেখে হাঁসফাঁস করতে করতে বলে—সুজি করেছি, খাবে?

—না।

পানের পিক ফেলতে বাথরুমে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিরে এল ফুলি। চাঁপার দিকে চেয়ে বলল—তুই দিনমান থাকবি তো চাঁপা, না কি দাদার সঙ্গে চলে যাবি? আমি একাহাতে আজকের দিনটা সামলাতে পারি না। ক্ষুদে ডাকাতরা সারা বাড়ি তছনছ করে, তার

ওপর আজ আবার ওদের বাপ শনিঠাকুরটি বাড়িতে আছেন। আমি বলি বরং তুই থেকে যা।

চাঁপা ঘাড় নাড়ল। বলে—সোনাবাবুর কাছছাড়া হতে ভাল লাগে না।

মুখটা খুশিতে ভরে ওঠে ফুলির, বলে—আহা, রোগা হয়ে গেছে।

দেবাশিস ভদ্রতাবশত চায়ে চুমুক দেয়। আসলে ফুলির বাসার চা সে খেতে পারে না। চায়ের সুঘ্রাণ নেই, আছে কেবল লিকার আর গুচ্ছের দুধ-চিনি। দুধ বেশি পড়ে গেছে, ফলে চা সাদা দেখাচ্ছে। ছেলেবেলায় বেশি দুধের চা'কে তারা বলত সাহেব চা। সাহেবদের রং ফর্সা বলেই বোধ হয় উপমাটা দিয়ে থাকবে।

–ফুলি, এ যে সাহেব চা! দেবাশিস বলে।

—ফুলি প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর বুঝে লজ্জা পেয়ে বলে—তোমার তো আবার সব সাহেবী ব্যাপার, পাতলা লিকার, অল্প দুধ-চিনি, ওসব কি আর মনে থাকে! আমাদের বাঙালী-বাড়িতে যেমনটি হয় তেমনটি করে দিয়েছি। দাও, আবার করে দিই।

—থাকগে। খারাপ লাগছে না। দেবাশিস বলে।

ফুলি সামনে মোড়া পেতে বসল। গায়ে মোটা মোটা গয়না, আঁচলে চাবি, সব মিলিয়ে ওর নড়াচড়ায় এক ঝনৎকার শব্দ হয়। জোরে শ্বাস ফেলে, শ্বাসের সঙ্গে একটা শারীরিক কষ্টে ওঃ বা আঃ শব্দ করে। সম্ভবত কোনো মেয়েলী রোগ আছে। শরীরের নানা আধি-ব্যাধির কথা বলে, কিন্তু বসে শুয়ে থাকে না কখনো। সারাদিন কাজকর্ম করছে স্টীম-রোলারের মতো।

বসে ফুলি বলল—দাদা, এবার রবির ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করো।

—কী ঠিক করব ?

—ওকে আর তোমার ফাঁকা ভূতুড়ে ফ্ল্যাটে রেখে লাভ কী?

সারাদিন ওর মনের মধ্যে নানা ভয়-ভীতি খোঁড়ে। দেখছো না, কেমন রোগা হয়ে যাছে! খাওয়ায় অরুচি, সারাদিন নাকি মুখ গোমড়া করে থাকে। সঙ্গী-সাথীও নেই।

— সব সয়ে যাবে।

—সইছে কোথায়! প্রায় সময়েই আমার কাছে এসে মায়ের কথা বলে। দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, ঘুমের মধ্যে দেখি খুব চমকে চমকে ওঠে। এ সব ভাল লক্ষণ নয়। মুখে কিছু বলে না, লজ্জায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁদে।

দেবাশিস একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে বলল—আমি তো ও যা চায় দিই।

—আহা! বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মা আর সঙ্গী। তা ও পায় কোথায়! আমি বলি, আমার কাছে থাক। মণিমা-মণিমা করে কৈমন অস্থির হয় দেখনি?

দেবাশিস একটু হেসে বলে—তোরই তো অনেক ক'জন, তার ওপর আবার রবি এসে জুটলে—

ফুলি ধমকে ওঠে—ও সব অলক্ষুনে কথা বলো না! ছেলেমেয়ে আবার বেশি হয় নাকি?

দেবাশিস হাসে, বলে—তোর তা'হলে এখনো ছেলেমেয়ের সাধ মেটেনি?

ফুলি কড়া গলায় বলে—না। মিটবেও না। আমি বাপু, ছেলেপুলে কখনো বাড়তি দেখি না। যত হবে তত চাইব। মা হয়েছি কিসের জন্য?

যদিও এটা কোনো যুক্তি নয়, তবু এর প্রতিবাদও হয় না। কারণ এ যুক্তির চেয়ে অনেক জোরালো জিনিস। এ হচ্ছে বিশ্বাস। শিশিরের সঙ্গে থেকেই বোধ হয় এইসব গ্রাম্যতা ওর মনে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই বোকামি তাই দেবাশিস একটু চুপ করে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়।

বলে—দেখি।

দেখবে আবার কী! রবিকে আমার কাছে দিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

—ওখান থেকে ওর ইস্কুলটা কাছে হয়, তাছাড়া একভাবে থেকে থেকে সেট হয়ে গেছে, এখন তোর এখানে এসে থাকলে দেখবি ওর মন বসছে না।

—কী কথা! এ বাড়ীতে এলে ও কখনো যেতে চায় দেখেছো?

—সে এক-দু'দিনের জন্য, পাকাপাকিভাবে থাকতে হলেই গোলমাল করবে।

—সে আমি বুঝব! তুমি বাপু ছেলেকে একেবারে সাহেব করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছো। আজকাল আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলে ফেলে, কথায় কথায় 'সরি' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে।

শিশির গামছা ছেড়ে লুঙ্গি পরেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—আসলে গরীবের বাড়ীতে রাখতে দাদার ভয়। এখানে সব খারাপ সহবৎ শিখবে। খানা-পিনাও তেমন সায়েন্টিফিক হবে না।

দেবাশিস মনের মধ্যে এসব কথাই ভাবে। এখানে দঙ্গলের মধ্যে পড়ে রবি তার আচার আচরণ ভুলে যাবে, স্মার্টনেস হারাবে। চীৎকার করতে শিখবে, খারাপ কথা বলতে শিখবে। এবং হয়তো বা দেবাশিসকে একটু একটু করে বিস্মৃত হবে।

দেবাশিস মৃদু গলায় বলে—না, সে সব নয়। আসলে ও আছে বলেই ফ্ল্যাটটায় ফিরতে ইচ্ছে করে।

ফুলি বলে—তুমি আর কতক্ষণের জন্যই বা ফেরো! রাত টুকু কেটে গেলেই তো আবার টো-টো কোম্পানি। ও যে একা সেই একা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—ভেবে দেখি।

—দাদা, আমি রবিকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। একটুও চিন্তা কোরো না।

—সে আমি জানি। শুধু একটু ভেবে দেখতে দে।

—ভাবতে ভাবতেই ওকে শেষ করে ফেলো না। এখানে থাকলে ও সব ভুলে থাকতে পারবে। ফাঁকা ঘরে থাকে বলেই ওর সব মনে পড়ে। আমার কাছে কত কথা এসে বলে!

দেবাশিস ফুলির দিকে একটু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখছিল। ছেলেপুলের কী অপরিসীম সাধ ওর। গর্ভযন্ত্রণার কথা ভাবে না, ঝামেলার কথা ভাবে না! দুবার ওর পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আজও দুঃখ করে। এই অভাব, দারিদ্র, দুঃসময়—এগুলো ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। দুটি বা তিনটি সন্তানের সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও কখনো বোধ হয় চোখ তুলে দেখে না। শুনলে বলে—'ওসব শোনাও পাপ।

দেবাশিস একটু হেসে বলে—পারিসও তুই!

ভিখিরির মতো ফুলি বলে—রবিকে দেবে দাদা?

দেবাশিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আজ উঠি রে।

সে উঠে দাঁড়ায়। চাঁপা দৌড়ে গিয়ে রবিকে বলে—সোনাবাবু, এসো। বাবা চলে যাচ্ছে। দেখা করে যাও।

কিন্তু রবি সহজে আসে না। দেবাশিস সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। চাঁপা রবিকে হাত ধরে নিয়ে আসে। দেবাশিস দেখতে পায়, ইতিমধ্যেই রবির চুল ঝাঁকরা হয়ে গেছে। ব্যানলনের গেঞ্জি বুক পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। মুখে চোখে একটা আনন্দের বিভ্রান্তি। দেবাশিসের দিকে চেয়েই রবি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল—বাবা তুমি যাও।

দেবাশিস ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে—আচ্ছা।

ফুলি সিঁড়ি পর্যন্ত আসে। কয়েক ধাপ নামে দেবাশিসের সঙ্গে। গলা নীচু করে বলে—শোনো দাদা।

দেবাশিস অন্যমনস্ক ভাবে বলে—উঁ।

রবি তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি হবে। ও বড় দুঃখী ছেলে। তুমি কেন বুঝতে পারছো না?

দেবাশিস হাসল। মড়ার মুখের মতো হাসি। তারপর ফুলিকে পিছনে ফেলে নেমে এল রাস্তায়।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে একটা কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ ওপরে তাকাল। চমকে উঠল ভীষণ। দোতলার রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা শরীর বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে রবি। আশেপাশে পিসতুতো ভাইবোনেরা। খুব উত্তেজিতভাবে কী যেন দেখছে দূরে। হাত তুলে আঙুল দিয়ে পরস্পরকে দেখাচ্ছে। হয়তো কাটা ঘুড়ি। কিংবা হেলিকপ্টার।

দেবাশিসের বুকের ভিতরটায় প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগে। গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে যেমন হয়।

—রবি! বলে একটা চীৎকার দেয় সে।

মস্ত ভুল হয়ে গেল চীৎকারটা দিয়ে। এমন অবস্থায় কাউকে ডাকতে নেই। রবির মা সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।

শরীরের আধখানা বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় রবি ডাকটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। দুলে উঠল শিশু-শরীর। শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা অবলম্বনের জন্য অসহায়-ভাবে হাত মুঠো করল। টালমাটাল ভয়ঙ্কর কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধিসময়। দেবাশিসের প্রায় সংজ্ঞাহীন শরীরটা টাল খেয়ে গাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। চোখ বুজে ফেলে সে। দাঁতে দাঁত চাপে।

রবি সামলে গেল। ওর ভাইবোনেরা ওকে ধরেছে। টেনে নামিয়ে নিচ্ছে রেলিং থেকে। ফুলি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

দেবাশিস অবিশ্বাসভরে চেয়ে থাকে। রবি রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাবার দিকে চেয়ে হাসে। তারপর হঠাৎ প্যাণ্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে আনে। বাপের দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে থাকে—ঠিসুং···ঠিসুং···

দেবাশিস একবার ভাবল ফিরে যাবে ফুলির বাসায়। তারপর

ভাবল—থাক। ওরও তো ছেলেমেয়ে আছে। কেউ তো পড়ে মরেনি কখনো!

রবির দিকে চেয়ে দেবাশিস একটু হাসে। তার বুকে কোথায় যেন রবির খেলনা রিভলভারের মিথ্যে গুলি এসে লাগে। সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে কোনো-ক্রমে হুইলের পিছনে বসে পড়ে। তারপর গভীরভাবে কয়েকটা শ্বাস নেয়।

গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে কেবলই দোতলার রেলিং থেকে ঝুঁকে-থাকা রবির চেহারাটাকে দেখতে পায়। চমকে চমকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চাপে। হুইলে তার মুঠো করা হাত প্রবল চাপে সাদা হয়ে যায়। পদে পদে ভুলভাবে গাড়ি চালাতে থাকে সে।··· রবির মা চন্দনা লাফিয়ে পড়েছিল সাততলা থেকে, কথাটা ভুলতে পারে না।

রবিও কি কিছু ভোলেনি? সব মনে রেখেছে!

তৃণার সঙ্গে দেখা হবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। দেবাশিস খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে থাকে।

॥ ছয় ॥

দুপুরের ফাঁকা রাস্তায় তৃণা একটু বেশী তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। পিছনে কে যেন আসছে! ফিরে দেখল। কেউ না। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, পিছনে কে আসছে। কে যেন চুপিচুপি আসছে। কার চোখ তীব্র ভাবে, গোয়েন্দার মতো নজর করছে তাকে। কেউ নয়। তবু তৃণা প্রাণপণে হাঁটে। বড় রাস্তায় দুখোর রোদ। দোকান বাজার বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা, তৃণা কি আজ খুন হবে? গোপন থেকে কোন আততায়ী কেবলই আসে তৃণার দিকে?

তৃণা চারধারে তাকায়। কেউ নয়। উল্টোবাগে চলে এসেছে অনেকখানি! বাসস্টপটা এখনো বেশ দূরে। তৃণা বেশী হাঁটতে

পারে না। হাঁটা জিনিষটা বড্ড ক্লান্তিকর। রিক্সাতেও সে কখনো ওঠেনা। বড্ড মায়া হয়। দুপুরের পীচ-গলা রাস্তায়, এই চাবুক রোদে রোগা মানুষগুলো রিক্সা টানে, তাতে সওয়ার হতে একদম ভাল লাগেনা তার।

ল্যান্সডাউনের মোড়ে পেট্রল-পাম্পের কাছ ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিওলা হাঁটু তুলে বসে ছোট্ট একটা বই পড়ছে। সম্ভবতঃ রেসের বই, কিংবা গীতাও হতে পারে। একা ট্যাক্সিতে তৃণা ওঠেনা। ভয় করে। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন কাঁপছে। ভয় করছে। উৎকণ্ঠা।

সাহস করে দু'পা এগোলো তৃণা।

—ভাই, ট্যাক্সি কি যাবে?

—যাবে। ট্যাক্সিওলা গম্ভীরভাবে বলে।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। তৃণা উঠতেই ট্যাক্সিটা ঐ দিকেই চলতে থাকে, তৃণা কিছু বলেনি। তখন সে সুস্পষ্ট এবং পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিল, রেবার ঘরে সে বসে আছে, আর রেবা হৃদয়হীনা রেবা তার দিকে স্বচ্ছ শীতল চোখে তাকিয়ে পরমূহূর্তেই সে তার ছেলেকে দেখতে পায়। মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান মনু তাকে কোলে করে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। কী সুন্দর মনুর গায়ের গন্ধটুকু। আবার দেখে শচীন পিংপিং টেবিলের ওপাশে বসে আছে, বলছে—তোমাকে আজকাল আমি লক্ষ্য করিনা···

ভ্রূ কোঁচকায় তৃণা। তার সংসারে সে আজকাল আর নেই। কেউই তাকে লক্ষ্য করেনা। এ কেমন? সে ও বাড়ির কারো মা, কারো গৃহকর্ত্রী। তার অতবড় পতন, ঐ কলঙ্ক, পরকীয়া ভালবাসা, এসব ওদের একেবারেই কেন উত্তেজিত ও দুঃখিত করে না? কেন ওদের শান্তি ও স্বাভাবিকতা অক্ষুন্ন আছে? এ কি শচীনের ষড়যন্ত্র! শচীন কি ওদের শিখিয়ে রেখেছে—ওর দিকে তাকিওনা, কথা বোলোনা, ওকে উপেক্ষা কর। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই।

ট্যাক্সিওলা আয়না দিয়ে তাকে দেখছিল। ছোটো আয়না, তাতে শুধু মধ্যবয়স্ক ও জোয়ান চেহারার ট্যাক্সিওলার ক্রূর চোখদুটো দেখা যায়। ফট্ করে চোখ পড়তেই চমকে উঠল তৃণা। আতঙ্কিত একটা শব্দ উঠে এসেছিল গলায়। অস্ফুট শব্দটা মুখে হাতচাপা দিয়ে আটকাল। বলল—থামুন।

—এইখানে নামবেন ? বলে ট্যাক্সিওলা গাড়ি আস্তে করল।

—এইখানেই। বলে তৃণা অবাক হয়ে দেখে, সে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে, এদিকে তার আসার কথা নয়। সে যাবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে। বার বার সে কেন তবে সে-জায়গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অন্যমনস্কতায়, বিভ্রমে ? তৃণা আস্তে করে বলল—এটা কোন জায়গা ! দেশপ্রিয় পার্ক ?

—হ্যাঁ, এখানেই নামবেন ? বলে মধ্যবয়স্ক জোয়ান লোকটা তার দিকে পরিপূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। লোকটার মুখে ঘাম, অশিক্ষার ছাপ ! বন্যজন্তুর মতো একটা কামস্পৃহা লক্ষ্য করে তৃণা। বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। গাড়ির দরজার হাতলটা কিছুতেই খুলতে পারছিল না তৃণা। খুব তাড়াহুড়ো করছিল। একবার মনে হল, লোকটা কোন কৌশলে দরজাটা আটকে দেয়নি তো ! যাতে তৃণা খুলতে না পারে ! লোকটাই হঠাৎ তার প্রকাণ্ড ঘেমো হাতটা বাড়িয়ে তৃণার হাতটা ঠেলে লকটা খুলে দিল।

তৃণা নেমে চলে যাচ্ছিল। খুব তাড়া। লোকটা পিছন থেকে খুব একটা ব্যঙ্গের গলায় বলল—ভাড়াটা কে দেবে ?

তাড়াতাড়িতে আর ভয়ে কত ভুল হয়। তৃণা ব্যাগ খুলে ভাড়া দিয়ে দিল। লজ্জায় কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ট্যাক্সিওলার চোখের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যই তৃণা এলোপাথাড়ি খানিক হাঁটল উদভ্রান্তের মতো, চলে এল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। কিছুতেই তার মনে পড়ছিলনা এখান থেকে কোন রুটের বাস ফাঁড়ি পর্যন্ত যায়। মনটা বড় অশান্ত,

বুকের মধ্যে কেবলই একটা পাখা ঝাপটানোর শব্দ, কাকাতুয়াটা ডাকছে···তৃণা···তৃণা···তৃণা

আজ দুপুরের কলকাতাকে নিঝুমপুর নাম দেওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা হু-হু, মন কেমন করা রাস্তা, রোদ গড়াচ্ছে, তৃণা ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে যাবে, কিন্তু সে বড় অনেক দূরের রাস্তা বলে মনে হয়। সে বড় অফুরান পথ। কোনোদিনই বুঝি যাওয়া যাবে না। বেলা একটা বেজে গেছে। তৃণার গায়ের চ্যানেল নাম্বাব সিক্সের গন্ধটা অল্প অল্প কবে উবে যাচ্ছে হাওয়ায়, বাতাসে চুল এলোমেলো।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল তৃণা। কি করে যাবে! সেই বারোটায় যাওয়ার কথা ছিল। দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতেই আবার হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করে পিছু ফিরে চাইল তৃণা। কে তাব পিছনে আসছে? কে তাকে লক্ষ্য করছে নিবিষ্টভাবে?

আতঙ্কিত তৃণা হঠাৎ দেখল, একটা বিয়াল্লিশ নম্বব বাস মোড় নিচ্ছে। মনে পড়ল, এই বাসটা ফাঁড়ি হয়ে যায়। চলন্ত বাসটার সামনে দিয়ে হরিণ-দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল তৃণা। বিপন্নার মতো চীৎকার করে বলল—বেঁধে ভাই, বেঁধে ······

প্রাইভেট বাস, যেখানে সেখানে থামে। এটাও থামল। তৃণা ভর্ত্তি বাসটায় একটু কষ্ট কবে উঠে পড়ে।

দেবাশিস যে উন্নতি কবেছে তা এমনি নয়। কতগুলো অদ্ভুত গুণ আছে তার। একটা হল ধৈর্য। তৃণা বাস থেকে নামতে নামতেই দেখল, বাসস্টপে দেবাশিসের গাড়ি থেমে আছে। আর সামনের জানালা দিয়ে অবিরল সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত তৃণা হাতের তেলোয় চেপে চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে গেল। খুব ফ্যাকাসে একটু হাসল।

দেবাশিস কিন্তু গম্ভীব। দরজাটা খুলে দিয়ে বলল—উঠে পড়ো।

তৃণা ঝুপ করে সীটে বসে বলল—অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো। আজ আমার বড় দেরী হয়ে গেল।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল—ঠিক উল্টো।

—মানে?

—দেরীটা আমারই হয়েছে। তুমি আসার দুমিনিট আগে আমি এলাম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, তুমি এসে ফিরে গেছ। আমিও চলে যাবো যাবো করছিলাম, হঠাৎ দেখি তুমি বাস থেকে নামলে। তোমার দেরী হল কেন?

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে—ঠিক বেরোবার মুখেই কতগুলো ইনসিডেণ্ট হয়ে গেল। রেবির ঘরে গিয়েছিলাম, ও ছিল না। হঠাৎ এসে বিশ্রী ব্যবহার করল। আর শচীনবাবুর সঙ্গেও একটু কথা কাটাকাটি, সেই থেকে মনটা এমন বিচ্ছিরি, আর অন্যমনস্ক, রাস্তা ভুল করে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। তোমার দেরী হল কেন?

দেবাশিস গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—তোমার সঙ্গে মিল আছে। ফুলির বাসায় রবিকে পৌঁছে দিয়ে বেরোবার সময়ে দেখি দোতলার রেলিং ধরে রবি... উঃ! মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে একবার শিউরে ওঠে দেবাশিস। তারপর আস্তে করে বলে—রবিকে ফুলি কেড়ে রাখতে চাইছে। রবিও আর আমার সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না!

তৃণা চুপ করে থাকে। একটা গভীর শ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো গভীর গর্ত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল—কি ঠিক করলে, রবিকে ওখানেই রাখবে?

—রাখতে চাইনি। তবু রয়েই গেল বোধ হয়। ওকে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ভীষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। দুটো ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছি, পুলিশ নাম্বার নিয়েছে। পাক সার্কাসে একটা বুড়ো লোককে ধাক্কাও দিয়েছি, তবে সে মরেনি। কিছুক্ষণ ঐরকম র‍্যাশ ড্রাইভ করে দেখলাম, আর গাড়ি চালানো উচিত হবে না।

অস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। বন্ধ অফিস খুলে অনেকক্ষণ ফাঁকা ঘরে বসে রইলাম। ঠিক নরমাল ছিলাম না। সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। রবি কেন আমাকে আর তেমন পছন্দ করছে না বলো তো! আমি তো ওকে সব দিই। তবু কেন? বুঝলে তৃণা, আজ ফাঁকা অফিস ঘরে বসে আমার মতো কেজো মানুষেরও চোখে জল এল।

—আস্তে চালাও, তুমি বড অন্যমনস্ক। গাড়ি টাল খাচ্ছে।

দেবাশিস সামলে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতে বলে—অফিসে বসেই একটা ডিসিসন নিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেলাম ফুলির বাড়িতে। তখন গাড়ি চালানোর মতো মনের অবস্থা নয়। গিয়ে বললাম—ফুলি, আজ থেকেই রবি তোর কাছে থাকল ফুলির সে কি আনন্দ! ঐ মোটা শরীর নিয়েও লাফ ঝাঁপ দৌড়োদৌড়ি লাগিয়ে দিল। রবি ঘুমোচ্ছিল, আমি আর ওকে ডাকিনি। ঘুমন্ত কপালে একটা চুমু রেখে চলে এসেছি। ছেলেটা বুঝি পর হয়ে গেল। যাকগে।

তৃণা কাঁদছিল। নীরবে, একটু ফোঁপানির শব্দ হচ্ছিল কেবল। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বলল—কেঁদোনা। সব কিছু কি একসঙ্গে পাওয়া যায়?

তৃণা মুখ না তুলে কান্নায় যতিচিহ্ন দিয়ে দিয়ে বলে—আমিও চলে এসেছি। চিরকালের মতো, আর ফিরব না।

দেবাশিস একটু গম্ভীর হল। শান্ত গলায় বলে—ভালই করেছো। শচীন কিছু বলল না?

—অনেক কথা বলল। তত্ত্বকথা। আমাকে সাহসের সঙ্গে তোমার কাছে চলে আসতে উপদেশ দিল।

দেবাশিস একটু ভ্রু কুঁচকে বিষয়টা ভেবে দেখে। তারপর বলে—শচীন ভেবেছে ও আমাকে চান্স্ দিচ্ছে। আই অ্যাম রেডি ফর দি ক্যাচ তৃণা। শচীন ইজ আউট।

তৃণা ঝুঁকে বসে কাঁদতে লাগল।

দেবাশিস কাঁদতে দিল তৃণাকে। একবার কেবল বলল—তোমার খিদে পায়নি তৃণা? আমার কিন্তু পেয়েছে।

তৃণা সে কথার উত্তর দিল না। কেবল নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

কান্নাটা বড়ই বিরক্তিকর। একটা মেয়ে সামনের সীটে উপুর হয়ে বসে কাঁদছে—এ একটা সীন। গাড়ির কাঁচ দিয়ে বাইরে থেকেই দেখা যায়। অনেকে দেখছেও। দেবাশিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। ইচ্ছে ছিল রেস্টুরেণ্টে খেয়ে নেবে। কিন্তু তৃণার এই বেসামাল অবস্থায় রেস্টুরেণ্টে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতেই যেতে হয়। আজ সকাল পর্যন্ত কী তীব্র পিপাসা ছিল তৃণার জন্য। এখনো কি নেই? কিন্তু কেবলই রবির কথা মনে পড়ছে, রবিকে ফুলির কাছে রেখে এল দেবাশিস। বদলে কি তৃণাকে পেল চিরকালের মতো? দু জনকে দুদিকের পাল্লায় বসিয়ে দেখবে নাকি কোনদিকটা ভারী?

কিছুতেই কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না যে তৃণা চলে এসেছে চিরকালের মতো। হাতের নাগালে বসে আছে। একই ফ্ল্যাটে এরপর থেকে তারা থাকবে। দেবাশিস ভেবেছিল, এ এক অসম্ভব প্রেম। দুটো নৌকো, স্রোত· ·আরো কি কি যেন।

তৃণা বাথরুমে স্নান করছে। দেবাশিস বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করে। বিকেল চারটে বাজে মোটে। প্রীতম একবার চা দিয়ে গেছে। তারপর দোকানে গেছে খাবার আনতে। তৃণা এলে তারা খাবে।

দেবাশিস সিগারেট ধরিয়ে তার ফ্ল্যাটের বিশাল জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। বহু নীচে ফুটপাথ। এই সেই খুনী জানালা। অত নীচে কী করে, কোন সাহসে লাফিয়ে পড়েছিল চন্দনা? হাত পা হঠাৎ নিসপিসিয়ে ওঠে তার।

ভাল করে পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে ঝুঁকে দেখল দেবাশিস। ঝিম ঝিম করে ওঠে মাথা। অবলম্বনহীন শূন্যতা তাকে দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে, এসো এসো। সাততলার ওপর সারাদিন, সব ঋতুতেই প্রচণ্ড হাওয়া খেলা করে, কী বাতাস! মার মার করে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা, বুক জুড়োনো বাতাস। তবু অত হাওয়াতেও দেবাশিসের মুখে ঘাম ফুটে ওঠে। কত নীচে ফুটপাথ! কী তীব্র আকর্ষণ অধঃপাতের! সবসময়েই, অবিরল পৃথিবী তার বুকের কাছে সবাইকে টানছে। যখন জানালার চৌকাঠের অবলম্বন জীবনে শেষবারের মতো ছেড়ে দিয়েছিল চন্দনা, ফুটপাথ স্পর্শ করবাব আগে এই যে অবলম্বনহীন দীর্ঘ শূন্যতা বেয়ে নেমে গিয়েছিল তার শরীর, এই শূন্যতাটুকু কিভাবে অতিক্রম করেছিল ও? বাঁচতে ইচ্ছে করেনি ফের? কারো কথা মনে পড়েনি? কেঁদেছিল? এই পথটুকু, এই শূন্যটুকুতে চন্দনা কি চন্দনা ছিল? খুব জানতে ইচ্ছে করে। দেবাশিস কোমর পর্যন্ত শরীবেব ওপরেব অংশ ঝুলিয়ে দিল জানালার বাইরে! চেয়ে রইল নীচের দিকে। পোকার মত মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে, একটা দুটো গাছ কালো মিশমিশে রাস্তা। কী ভয়ঙ্কর! মুখের সিগারেটটা বাতাসে পুড়ে গেল দ্রুত। শেষ অংশটা ছুঁড়ে দিল দেবাশিস। বাতাসে খানিকটা ভেসে গেল, তারপর অনেক অনেকক্ষণ ধরে পড়তে লাগল নীচে···নীচে···নীচে।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ। তৃণা বেরিয়ে এল।

দেবাশিস শরীরটা তুলে আনল ভিতরে। বাতাস লেগে চোখে জল এসে গেছে।

তৃণার কান্না আর বিষণ্ণতা স্নানের পর ধুয়ে গেছে। কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। শোওয়ার ঘরে দুটো একা খাট, বিছানা পাতা। তার পাশে একটা পর্দা ঘেরা সাজবার ঘর। জানালার পাশেই লম্বা আয়না লাগানো সাজবার টেবিল। তৃণা সেখানে গিয়ে বসল। চন্দনা এখানে বসে সাজত।

তৃণা নিজেকে আয়নায় দেখল। কিছু তেমন দেখবার নেই। একটু সামান্য সাজগোজ করল। চুলটা ফেরাল। কোনদিনই সে খুব একটা সাজেনা।

আয়নায় দেবাশিসের ছায়া পড়ল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটু হাসি। চুলগুলো খুব এলোমেলো।

বলল—কেমন লাগছে তৃণা ?

তৃণা বিষণ্ণ হেসে বলল—ভালই।

—আজ থেকে···বলে চুপ করে দেবাশিস। কী বলবে ?

তৃণা কথাটা পূরণ করে নিল মনে মনে। লজ্জায় মাথা নোয়াল। বলল—তুমি যাও দেব। স্নান করে এরে এসো।

দেবাশিস আঙ্গুলে ধরা সিগারেটটা তুলে দেখাল, বলল—যাচ্ছি। সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—অন্ততঃ ও ঘরে যাও। পুরুষের সামনে আমি সাজতে পারিনা।

—ও। বলে দেবাশিস পর্দার ওপারে গেল। ওখান থেকেই বলল—শোনো তৃণা, তোমার যা যা দরকার প্রীতমকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আজ রোববার, দোকান অবশ্য সবই বন্ধ।

—কী আনাবো ? আমার কিছু দরকার নেই।

—এক কাপড়ে তো বেরিয়ে এসেছো।

—চন্দনার শাড়ি টাড়ি কিছু নেই ?

—না। সব বিলিয়ে দিয়েছি।

—কেন দিলে ?

—রবির জন্য। ওসব থাকলেই তো ওর মায়ের কথা মনে পড়ত.

তৃণা বেশ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একথায় বুকে একটা ধাক্কা খেল। তবু হেসে বলে—তবু কি মনে পড়েনা ?

—পড়ে। সেটা চেপে রাখে। আমার ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমি সাজাইনি, চন্দনা সাজিয়েছিল। সেইভাবেই সব আছে। এক

একবার ভাবতাম সাজানোর প্যাটার্ন পাল্টে দিই। কিন্তু সময় পাইনি, এত কাজ। সেই সাজানো ঘরে চন্দনার কথা ওর মনে তো পড়বেই। এরার তুমি সাজাও।

—দূর বোকা। মনে পড়া কি ওভাবে হয়। তুমি জানোনা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলল—আর রবির জন্য আমার ভাবনা নেই। ফুলির বাড়ির দঙ্গলে মিশে গেলে আর কিছু ওর মনে থাকবে না।

—সিগারেটটা শেষ হয়েছে?

—হয়েছে।

—এবার যাও। আমার এখন খুব খিদে পাচ্ছে।

—তোমার কি কি দরকার বললেনা?

—অনেক কিছুই দরকার। কিছু তো আনিনি। সে পরে হলেও চলবে।

—লজ্জা কোরোনা। এ তো আর পরের বাড়ি নয়। তোমার নিজের।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে বলল—তাই বুঝি?

—নয়?

তৃণা একটু হেসে বলে—এত সহজে কি নিজের হয়? অনেক সময় লাগবে। আমাকে একটু সময় দিও, তাড়া দিওনা।

দেবাশিস একটু উষ্মাভরে পর্দার ওপাশ থেকে বলে—কেন? সময় লাগবে কেন?

—লাগবেনা! গাছ উপড়ে দেখো তার শিকড়ের সবটা কি একবারে উঠে আসে? কতো শিকড়বাকড়ের ছেঁড়া সুতো কিছু কিছু মাটির মধ্যে থেকে যায়।

—তৃণা।

—উঁ।

—গাছ তো একটানে ওপড়ানো হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে তার শিকড়ের মাটি ক্ষয় হয়ে ছিল না কি।

—আবার বলছি, তুমি বোকা।

—কেন?

—উপমা দিয়ে কি সব বোঝানো যায়? গাছের সঙ্গে মানুষের কিছু তফাৎ আছেই।

পর্দা সরিয়ে উত্তেজিত দেবাশিস এ ঘরে চলে এল হঠাৎ। মেঝেতে তৃণায় কাছে বসে উর্দ্ধমুখ হয়ে বলল—তৃণা, আমি বড় কাঙাল।

—জানি তো।

—আজ আমার কেউ নেই।

তৃণা তাকিয়ে রইল।

দেবাশিস বলল—আর আমাকে এখন ওসব ভয়ের কথা বোলানা। তোমারও যদি ছেঁড়া শেকড় অন্যজায়গায় থেকে থাকে তবে আমার কি হবে? আজ থেকে রবিও পর হয়ে গেল।

তৃণা স্নিগ্ধস্বরে বলল—রবির জন্য তোমার বুকের ভিতরটা কেমন করে দেব, তা বোঝোনা!

—ভীষণ বুঝি।

—ওটুকু কি আমার হতে নেই?

দেবাশিস চুপ করে গেল। জোব্বা জামার পকেট থেকে ফের সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। ধরাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—বুঝেছি।

তৃণা তেমনি স্নিগ্ধস্বরে বলল—আমরা তো আর ঠিক সকলের মতো হতে পারিনা।

দেবাশিস বলল—তাও ঠিক। তবে আমরা কিরকম হবো তৃণা?

—খুব সুখী হবোনা, একটু কি যেন থেকে যাবে দুজনের মধ্যে!

—তুমি কী ভীষণ স্পষ্ট কথা বলছ আজ তৃণা!

—আজই বলে নেওয়া ভাল।

—কেন? আজই কেন?

তৃণা চোখ মুছে হাসিমুখে বলে—আজ সপ্তাহের ছুটির দিন। তোমার সময় আছে। কাল থেকেই তো তুমি আবার ব্যস্ত মানুষ। তোমার কি আর সময় হবে?

—তুমি কথাটা ঘোরালে তৃণা।

—তুমি বাথরুমে যাও। আমার খিদে পেয়েছে!

দেবাশিস তবু বসে রইল। চুপচাপ। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে—তৃণা।

—বলো।

—মানুষকে তার সব সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে আনা যায় না। একজনকে ভাল না বাসলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এমন নয়। আবার কাউকে ভালবাসলেই যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল এও নয়। তবে ভালবাসা দিয়ে আমরা কী করব?

তৃণা কপালটা টিপে ধরে বলল—ও, আবার সেই তত্ত্বকথা! জানোনা মেয়েরা তত্ত্বকথা ভালবাসেনা। মাথা ধরেছে, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে প্রীতম। বড় রেস্টুরেণ্টের দামী সব খাবার। প্রীতমের মুখে খুব একটা হাসি নেই। কেবল বিনয় আছে।

দেবাশিস যখন খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে বসল এখনও তৃণা নিজের কপাল টিপে বসে আছে, বলল—তোমার চাকরকে পাঠিয়ে একটু মাথা ধরার বড়ি আনিয়ে দাও।

দেবাশিস মৃদুস্বরে বলে—ও তোমার চাকর। অবশ্য পাঠানোর দরকার নেই। মাথাধরার বড়িটড়ি আছে বোধ হয়। খুঁজতে হবে।

—খিদে চেপে রাখলে, বা কাঁদলে আমার মাথা ধরে।

দেবাশিস চোখ তুলে ইংগীতে প্রীতমকে সরিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে তৃণার একখানা হাত ধরে বলল—তুমি প্রস্তুত হয়ে

আসোনি জানি। হুট্ করে চলে এসেছো। তাই কাঁদছো। কিন্তু আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম তোমার জন্য।

তৃণা হেসে বলল—খুব প্রস্তুত! একখানা শাড়িও যদি কিনে রাখতে! কাল আমাকে বাসি কাপড়ে সকালবেলাটা কাটাতে হবে, যতক্ষণ শাড়ি কেনা না হয়।

—একটা দিন সময় দাও! প্লীজ। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ দোকান বন্ধ।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—সময়! সময়! দাঁড়াও, সময় নিয়ে কি একটা কবিতার লাইন মনে আসছে···

এলনা। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।

দেবাশিস বলে—খেয়ে একটু রেস্ট নাও। শোওয়ার ঘরের পর্দাগুলো টেনে দিচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকো একটু।

—তুমি কোথায় যাবে?

—কোথাও না। তোমার কাছেই বসে থাকব। বক বক করব।

তৃণা সস্নেহে হাসল।

পাঁচটা প্রায় বাজে। সাততলা ফ্ল্যাটের শাশির গায়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল সোনালী রোদ এসে পড়েছে। এখনো অনেক বেলা আছে। অন্ধকার হতে এখনো অনেক বাকি। পর্দায় ঢাকা শোওয়ার ঘরে শুয়ে আছে তৃণা। গায়ে খয়েরী পর্দার আলোর আভা। দুটো বড়ি খাওয়ার পর আস্তে আস্তে মাথাধরাটা সেরে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। তবু কি ঘুম আসে! দেবাশিস অনেকক্ষণ মাথাটা টিপে দিল। ঝিম্ মেরে শুয়ে ছিল তৃণা, ঘুমের ভান করে। সে ঘুমিয়েছে মনে করে দেবাশিস উঠে গেছে পা টিপে টিপে।

ঘরটা ঠিক অন্ধকার হয়নি। আবার আলোও নেই। সাততলার ওপর খুবই নিরাপদ আশ্রয়। একা শুয়ে আছে তৃণা। মাথা ধরা সেরে গেছে। নরম বিছানায় এলিয়ে আছে ক্লান্ত শরীর।

এ একরকমের আলস্য। সুন্দর আলসনী। কিন্তু ঘুম হবে না। আরো কতকাল ঘুম হবে না তৃণার।

সে চোখ চেয়ে দেখল, ছাদের মসৃণ রঙ, চৌকো দেয়াল। দেয়ালে রহস্যময় আলো। চেয়ে থাকতে সেই সুরসুরির মতো একটা অনুভব। কে যেন দেখছে। খুব নিবিষ্টভাবে দেখছে তাকে।

চমকে উঠল তৃণা। মাথাটা একবার তুলে চারদিকে তাকাল। আবার মাথাটা বালিশে রেখে চোখ বোজে! কিন্তু অবিরল তার ঐ অনুভূতি হয়, কে যেন দেখছে। ভীষণ দেখছে। চন্দনার ভূত? নাকি তাব মনেরই প্রক্ষেপ? সে নিজেই হয়ত। ভাবতে ভাবতে মুখটা আস্তে ফেরাল তৃণা। চোখটা আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ভীষণভাবে চীৎকার করে উঠে বসে সে—কে? কে?

খাওয়ার ঘবের দিকটার দরজার পর্দার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পর্দাটা আস্তে সরিয়ে মুখ বাড়াল ভিতরে। ভার গলায় বলে—আমি, প্রীতম।

তৃণা অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থেকে বলে—কী চাও?

চাকরটা একটু ভয়ের হাসি হেসে বলে—সাহেব বলে গেলেন, আপনি ঘুম থেকে উঠলে খবর দিতে, উনি একটু কোথায় বেরোলেন। এক্ষুনি আসবেন।

—কোথায় গেছেন?

—বলে যাননি। গাড়ি নিয়ে গেলেন দেখেছি।

—ও।

তৃণার বুকের ভিতরটা এখনো ঠক্ ঠক্ করছে। শ্লথ আঁচল টেনে নিয়ে সে উঠল। বলল—দাঁড়াও। তোমাদের ঘরটরগুলো আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। চিনে রাখি।

চাকরটা উত্তর করল না, খুশীও হয়নি। তবু এক রকম বিরক্তি বা ঘেন্না চেপে রাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও হয়তো ভাবছে, সাহেব রাস্তার মেয়েছেলে ধরে এনেছে, রাখবে। দেবাশিস ক্ষে

ওকে বলেনি যে তৃণা আসলে কে! বললেও বুঝবে না। এমন অবস্থার দুটি মানুষের ভিতরকার প্রেমের সত্য কে কবে বুঝেছে। সবাই একটা কিছু ধরে নেয়।

শোওয়ার ঘর দুটো। একটা খাওয়ার ঘর। একটা বসবার। অনেকটা জায়গা নিয়ে খোলামেলা ফ্ল্যাট। দ্বিতীয় শোওয়ার ঘরটা ববির। সেখানে অনেক খেলনা, ট্রাইসাইকেল, ছবির বই, ছোট্ট ওয়ার্ডরোব। এই ঘরটায় একটু বেশীক্ষণ থাকল তৃণা। চাকরটাকে বলল— এককাপ কফি করে আনো।

ফোনটা বাজছে বসবার ঘরে। বাজছেই। চাকরটা রান্নাঘরে। ওখান থেকে শুনতে পাবে না। তৃণা ইতঃস্তত করছিল, ফোনটা কি সে ধরবে? পরমূহূর্তেই ভাবল, অমূলক ভয়। এ বাড়িতে যদি তাকে থাকতেই হয় তবে এসব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। সে উঠে এল বসবার ঘরে। ফোন হাতে নিয়ে অলস গলায় বলে—হ্যালো।

একটা কচি গলা শোনা গেল—বাপি?···ওঃ···থেমে গেল স্বরটা। তারপর নম্বরটা বলে জিজ্ঞেস করল—এটা কি ঐ নম্বর?

তৃণা বুঝে নিল, রবি। ফোনের গায়ে লেখা নম্বরটা তৃণারও তো মুখস্থ। বলল—কে বলছ?

—তুমি কে? বলে কচি গলাটা অপেক্ষা করল। হঠাৎ ভয়ার্ত গলায় বলল—মা?

তৃণা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ফোনটা কানে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। রবি ফোন করছে। যদি তৃণা রং নাম্বার বলে ফোন ছেড়ে দেয় তো রবি আবার ফোন করবে, শুধু আজ নয়, কালও করবে। হয়তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে দরকার পড়বে তার, তৃণা কোথায় পালাবে? পালাবেই বা কেন? তবু প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর জন্য একটু সময় দরকার। সে চোখ বুজে বলল—রং নাম্বার।

ফোন রেখে দিল। ভেবে পেল না, রবি কেন মা কিনা জিজ্ঞেস করল।

প্রীতম কফি করে এনেছে। সেই সময়েই ফোনটা আবার বাজে। প্রীতম তার দিকে তাকায়। তৃণা ঘাড় হেলিয়ে বলে—রবি ফোন করছে। ধরো। ওকে আমার কথা বোলো না।

প্রীতম ফোন তুলে নিয়ে বলে—হ্যালো। রবিবাবু?

—...

—না তো। ফোন বাজেনি।

—...

—সাহেব বাইরে গেছেন।

—...

—না। আমি একা। তুমি আর আসবে না?

—...

—চাঁপাদি আসবে না? আচ্ছা বলে দেবো। তোমার সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দেবো।

—...

—আচ্ছা। তুমি আসবেনা কেন?

—...

—এলে বলব। ছাড়ছি।

ফোন রেখে প্রীতম একবার আড়চোখে তৃণার দিকে চেয়ে বাইরে চলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা। দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

তৃণা ভেবেছিল দেবাশিস এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অপ্রস্তুত। দেবাশিস নয়। টেরিলিন পরা দিব্যি ঝকমকে একজন যুবা পুরুষ। সেও একটু অপ্রস্তুত। বলল—দেবাশিস নেই?

—না। বেরিয়েছে

—ও। বলে খুব কৌতূহলভরে চেয়ে দেখল তৃণাকে।

তৃণা কি ওকে বসতে বলবে?

লোকটা নিজেই বলে—রবি নেই?

—না।

লোকটার চোখে স্পষ্টই একটা প্রশ্ন—আপনি কে? কিন্তু লোকটা সে প্রশ্ন করে না, ভদ্রতায় বাঁধে। তাই বলল—আমি রবির মামা।

—ও। আসুন।

—বসে আর কি হবে। কেউ নেই যখন। বলতে বলতেও যুবকটি কিন্তু ঘরে আসে। একটু ইতঃস্তত করে বসে। একটা শ্বাস ফেলে হাতে হাত ঘষে বলে—আপনি ওর রিলেটিভ বোধ হয়।

তৃণা মৃদু হেসে বলে—হ্যাঁ।

—চন্দনা আমার দিদি ছিল।

তৃণা তার এলো চুলের জট আঙুলে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—বুঝেছি। বসুন, ও এসে পড়বে।

যুবকটি ঘড়ি দেখে বলে—একটু বসতে পারি। আমি ভাবছিলাম—বলে একটু কথা সাজিয়ে নিয়ে বলে—আসলে কাল আমাদের ম্যারেজ-অ্যানিভার্স্যারি,। বলছিলাম কি দেবাশিসদা তো যাবেনই, সেইসঙ্গে আপনিও...যদিও ঠিক আচমকা এভাবে—

তৃণার ছেলেটির জন্য মায়া হয়। বুঝতে পারছে না, বুঝতে চাইছে। বলল—কফি খান। ও এসে পড়বে।

ছেলেটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখতে থাকে। চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নেয়। কিন্তু দেখে। তৃণা কফি বানাতে বলবার ছল করে উঠে এল। রান্নাঘরে প্রীতমকে খবর দিয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বসে রইল চুপচাপ। শুনল, ওঘরে প্রীতমের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। চাপা স্বর। এরকমই হবে এর পর থেকে। তৃণার জায়গাটা স্থির হতে অনেক সময় লাগবে। অনেক

সময়। তৃণা শুষ্কমুখে বসে থাকে। চুলের জট ছাড়ায় অন্যমনে।

দেবাশিসের ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। তখনো ছেলেটা বসে আছে সামনের ঘরে। আর দেবাশিসের হাতে কয়েকটা শাড়ির প্যাকেট, রজনীগন্ধার ডাঁটি, কসমেটিক্‌সের বাক্স, খাবারের বাক্স। চন্দনার ভাই সে সব দেখে অবাক। পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখল তৃণা।

না, দেবাশিস খুব একটা ঘাবড়াল না। চালাক লোকরা এরকম বিপদে পড়লে খুব গম্ভীর হয়ে যায়। দেবাশিসও হল। দু চারটি কী কথা হল ওদের। ছেলেটা চলে গেল।

দেবাশিস বেশ হাঁক ছেড়ে ডাকল—তৃণা।

তৃণা ঘরের মাঝখানটায় না গিয়ে পর্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—কি ?

দেবাশিস একগাল হাসি হেসে বলল—সব এনেছি।

—কোত্থেকে ?

—তোমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হঠাৎ মনে পড়ল, যাদবপুরে যখন থাকতাম তখন দেখেছি ঐ অঞ্চলে রবিবারে দোকান খোলা থাকে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, দেখ তো সব।

সব দেখে তৃণা হেসে কুটি পাটি। বলল—কী এনেছো এসব ?

—কেন ?

—এত রংচঙে শাড়ি আমি পরি নাকি ?

—পরো না ?

—এসব তো রেবা পরে। আর অত কসমেটিক্স! হায় রে, আমি কবে আবার ওসব আলট্রা মর্ডান লিপষ্টিক মাখি, কিংবা কাজল!

দেবাশিস হেসে বলে—এবার মেখো। বুড়ি সাজা তোমার কবে ঘুচবে বলো তো!

—মেয়ে বড় হয়েছে দেব, কদিন পরেই প্রেম করবে। এখনই করছে কিনা কে জানে!

দেবাশিস হেসে বলে—বাঙালি মেয়েদের ঐ হচ্ছে রোগ। তুমি সাজবেনা কেন তৃণা ?

তৃণা শুধু হাসল। স্নিগ্ধ হাসি। বলল—রবি ফোন করেছিল।

দেবাশিসের মুখের হাসিটা মরে গেল, বলল—কী বলল ?

—আমি ধরেছিলাম। রং নাম্বার বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে আবার ফোন করেছিল, তখন প্রীতম ধরে।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—থাকগে।

উঠে পোশাক পাল্টে এল দেবাশিস। চা খেল ফের।

ডাকল—তৃণা।

—উঁ।

—কিভাবে শুরু করা যায় বলো তো।

—কী ? কিসের কথা বলছো ?

—বুঝতে পারছো না ?

—না তো।

—তোমার আর আমার এই জীবনটা।

—শুরু আবার করবে কিভাবে ?

—ধরো বিয়ে হ'লে পুরুতের মন্ত্র, ফুলশয্যা টয্যা দিয়ে একটা শুরু করা যায়। রেজিস্ট্রি করলে তারও সরকারী মন্ত্র আছে। আমরা কি দিয়ে শুরু করব ?

তৃণা লজ্জা পেয়ে বলে—ওসব বোলোনা। কানে লাগে। আমরা কিছু শুরু করলাম, নাকি শেষ করে এলাম ?

—তোমার কি তাই মনে হয় ? তার উত্তরে বলা যায় যে, একটা শেষ না করলে অন্যটা শুরু করা যায় না তৃণা।

—ফের তত্ত্বকথা।

—তুমি যে শুরুটাকে শেষ বলছ !

—শোনো দেব, আমি কিছু শেষ করে আসিনি। শুরুর কথাও ভাবিনি। আমি বাড়িতে ভূতের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছি।

আমি কি করছি আমি নিজেও জানিনা। মাথার ভিতরটায় বড় গণ্ডগোল। আজ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু একটা জিনিস জানি।

—কী তৃণা? আগ্রহে দেবাশিস ঝুঁকে বসে।

—তোমাকে আমার ভীষণ দরকার এ সময়ে। আর কিছু না।

—তৃণা, তবে কি আমরা সেই আদিমভাবে শুরু করবো! যখন কোনো অনুষ্ঠান ছিল না, কেবল শরীর ছিল!

—ছি:। ওভাবে বলে না।

দেবাশিস হেলান দিয়ে বসে বলে—ছেলেবেলায় আমি ছিলাম বদমাস। মেয়েদের হাতে চিঠি গুঁজে দিতাম। বসন্তবাবুর বাড়ির ছাদে প্রত্যেকদিন ঘুড়ি গোঁত্তা মেরে নামিয়ে দিতাম, তাতে লেখা থাকত, আই লাভ ইউ। বসন্তবাবুর মেয়ে বাণীকে উদ্দেশ্য করে' তখন শুরু করার কোনো প্রবলেম ছিল না। ভাবতে শিখিনি, রচনা করতে শিখিনি, সাজাতে শিখিনি, ঐ ভাবেই শুরু করতাম। চন্দনার সঙ্গেও হুট্ করে শুরু। প্রথমে শরীর, তারপর ভালবাসার চেষ্টা, দেন ফ্রাস্ট্রেশন অ্যাণ্ড দি এণ্ড, তোমাকে নিয়ে তো সেভাবে শুরু করা যায় না। আজ আমার মস্ত প্রবলেম।

—আজকের দিনটা অত ভেবো না। মাথা ঠাণ্ডা করো।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলে—আজকের দিনটা অদ্ভুত। বুঝলে! আজ রবিকে পার্মানেন্ট্‌লি ওর পিসির বাড়িতে দিয়ে এলাম। আর তারপরই শুনলাম তুমি চলে আসছ। শচীন কিছু বলল না?

—কী বলবে?

—অধিকার ছেড়ে দিল এক কথায়? তুমিই বা কী বলে এলে?

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—কী বলব? আমি কিছু বলে আসিনি।

দেবাশিস চমকে উঠে বলে—বলে আসোনি?

—না। আমি প্রায়ই যেমন বেরোই তেমনি বেরিয়ে এসেছি।

—আমার কাছে এসেছো সে কথা কেউ জানে না?

—না।

—কাউকে বলোনি ?

—না।

—বোকা।

—কেন ?

—তুমি না ফিরলে ওরা তো থানা পুলিশ করবে। হাসপাতালে খোঁজ নেবে।

—নেবে! বলছো ?

—নেবে না ?

—আমার তো মনে হয় না। ওরা কি জানে যে আমি আছি ?

—তুমি বোকা তৃণা। বলে আসলেই হত। শচীনবাবু কি তোমাকে কামড়াত ?

—তা নয়। ওরা আমাকে নিয়ে বহুকাল ভাবে না। আজ একটু ভাবুক।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—তা হয় না।

বলেই উঠে গেল দেবাশিস। ডায়াল করতে লাগল। তৃণা ওর কাছে গিয়ে বলল—ফোন কোরোনা। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিরুদ্দেশ থাকতে দাও। ওরা ভাবুক।

—তা হয় না। মাথা নাড়ল দেবাশিস। ফোন কানে তুলে শুনে বলল—এনগেজড।

তৃণা একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল।

দেবাশিস ঘুরে বলল—আমি যা করব তা পাকাপাকি। কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না, দ্বিধা থাকবে না।

॥ সাত ॥

পৌনে সাতটা বাজেনি এখনো। বাজছে প্রায়। সাততলার ঘরের শার্শি দিয়ে দেখা যায়, কলকাতার ওপরকার আকাশটা মস্ত

বড়। আকাশে তারা ফুটেছে। শহরটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আলোয় তিলোত্তমা।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। কিংবা ঠিক অন্ধকার নয়। একটা রঙীন কাচের ঢাকনার ভিতরে শূন্য শক্তির আলো জ্বলছে। জানালার পর্দা সরানো। বাইরে চাঁদ। ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নার চৌকো চাঁপা রঙের আলো পড়ে আছে। আর ঝড়ের মতো বাতাস।

দেবাশিস একা ভূতের মতো বসে আছে। তার পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। সামনে দুটো ঠ্যাং ছড়ানো, সোফার কাঁধে হেলানো মাথা। ছাদের দিকে মুখ। দুটো হাত অসহায় ভাবে দুদিকে পড়ে আছে। সে তৃণার কথা ভাবছে! জলস্রোত উল্টোপাল্টা, পালে পাগলা বাতাস, তবু বিপরীতগামী দুটি নৌকো একটা অন্যটার সঙ্গে জুড়ে গেল। বা:। বেশ।

তৃণা ওঘরে সাজছে। তারা বেড়াতে যাবে। তৃণা যেতে চায়নি। শরীরটা আজ ভাল নেই। দেবাশিস বলেছে—বেড়ালে মনটা একটু হাল্কা হয়। তোমার তো শেকড়ের প্রবলেম আছে।

তৃণা বেড়াতে ভালবাসে না। তার প্রিয় অভ্যাস ঘরের কোনে একা থাকা। ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, বই পড়বে, গান শুনবে। কেউ কথা-টথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। রোগে ভুগে ভুগে ছেলেবেলা থেকে ওর ঐ অভ্যাস হয়ে গেছে।

ফোনটা বাজছে। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিল।

—হেল্লো।

মহিলাকণ্ঠে কে বলল—দেবাশিস দাশগুপ্ত আছেন?

—বলছি।

—ও:। দাদা...

ফুলি। ফুলির গলা টেলিফোনে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। ভীষণ ভয় খেয়ে গেল দেবাশিস। শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল বিদ্যুৎ স্পর্শে। রবির কোনো কিছু হয়নি তো।

—ফুলি! কী হয়েছে?

—তুমি ফিরেছো! বাঁচা গেল। রবি সেই থেকে বাবা-বাবা করছে। তুবার ফোন করেছিল।

—কী হয়েছে?

—কিছু না। কী হবে? অত ভেবোনা তো। রবি আছে আমার কাছে, আর আমি অনেক ছেলেপুলের মা।

দেবাশিস বিরক্ত হয়ে বলে—কী ব্যাপার বলবি তো!

—রবি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে, বাবা কেন দেরী করছে ফিরতে!

—মন খারাপ নাকি!

—না না। দস্যিপনা করছে সব সময়ে। বেশ আছে।

—ওকে ফোনটা দে।

একটু পরেই রবির উচ্চকিত গলা শোনা গেল—বাবা।

—বলো। ভারী স্নিগ্ধ হয়ে গেল দেবাশিসের গলা।

—আমরা বেড়াচ্ছি।

—কোথায়?

—ট্যাক্সি করে বেরিয়েছি। এখন আছি শ্যামবাজারে।

—সঙ্গে কে আছে?

—মনিমা, পিশেমশাই, নিনুকু...

—এনজয় ম্যান।

—বাবা, আমার বই, জামা প্যাণ্ট, খেলনা, সব কবে পাঠাবে?

—কাল প্রীতম দিয়ে আসবে।

—এখান থেকেই স্কুলে যাবো তো!

—যেও।

—আব দিদি আমার কাছেই থাকবে তো বাবা? দিদি গল্প না বললে আমার খাওয়া হয় না। মণিমা বলেছে চাঁপা থাকুক।

—থাকুক।

—তুমি রাগ করোনি তো বাবা?

—রাগ! না রাগ করব কেন?

—আমি যে মণিমার কাছে চলে এলাম!

—তা বলে রাগ করব কেন?

—তুমি যে আমাকে ছাড়া থাকতে পারো না।

দেবাশিস একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—পারি বাবা। পারতে তো হবেই।

—নিনকু বলছিল—তোর বাবা তোকে ছাড়া একা একা ভয় পাবে, দেখিস। আমাদের বাড়িতে কি ভূত আছে বাবা?

—ভূত? কে তোমাকে ভূতের কথা শেখাচ্ছে? ভূত টুত আবার কি?

—থাপি বলছিল।

—কি বলছিল?

রবি বোধহয় একটু লজ্জা পায়। একটু থেমে বলে—বাবা, মানুষ মরে গেলে তো ভুত হয়! তাই—

—তাই কি।

—থাপি বলেছে। আমি না।

—কি বলেছে?

—বলেছে মা মরে গিয়ে নাকি ভূত হয়ে আছে ও বাড়িতে।

—ওসব বাজে কথা রবি। ওসব বিশ্বাস করতে নেই।

—বুড়োদাও বলেছে—ও বাড়িতে আর যাসনে রবি। গেলে তোর মা ঠিক তোর ঘাড় মটকে দেবে। ভূতেরা নাকি যাদের ভালবাসে তাদের মেরে নিজের কাছে নিয়ে যায়।

—ছিঃ রবি। এসব কথা শিখলে তোমাকে আমি ওখান থেকে নিয়ে আসব।

—দিদিও আমাকে কত ভূতের গল্প বলে!

—আমি চাঁপাকে বারন করে দেবো। ওসব গল্প শুনোনা!

—আচ্ছা। কিন্তু বাবা—

—বলো। দেবাশিসের গলাটা গম্ভীর।

—আমি যখন আফ্‌টারনুনে ফোন করেছিলাম তখন—

—তখন কি ?

—আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাড়িতে মা ফোন ধরেছে।

—কি যা তা বলছ ?

—না না, ওটা রং নাম্বার ছিল। কিন্তু যে লেডি ফোনটা ধরেছিলেন তার গলা শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মার ভূত ঠিক ফোন ধরেছে।

—এ রকম ভাবতে নেই। আর ভেবোনা।

—বাবা, কাল আমি ইস্কুলে যাবো না।

—কেন ?

—আমি তো স্কুল-ড্রেস আনিনি, বই খাতাও নয়।

—দেবাশিস একটু ভেবে বলল—ঠিক আছে। পরশু থেকে যেও। স্কুলে চিঠি লিখে দেবো, বাস এবার ওখানে যাবে।

—কাল তাহলে আমার ছুটি বাবা ?

—ছুটি।

—কাল তাহলে কোথায় বেড়াতে যাবো বলো তো !

—কোথায় ?

রবি ফোনে হাসল। কী স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি। বলল—মণিমা বলেছে কাল আমরা তোমার ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবো।

দেবাশিস উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—এখানে ! এখানে কাল এসে কী করবে ? আমি তো থাকব না।

—মণিমা, বলেছে কাল নিজে আমাকে নিয়ে যাবে, আমার সব জিনিস গুছিয়ে আনবে, আর আমাদের ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসবে।

—না, না তার দরকার নেই।

—যাবোনা ?

—দরকার কি রবি? আমিই পাঠিয়ে দেবো।

– দাঁড়াও তাহলে, মণিমাকে বলি।

ফোনের মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে রবি ফুলির সঙ্গে পরামর্শ করছে। দৃশ্যটা স্পষ্টই দেখতে পায় দেবাশিস। খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই সে ভেবে দেখল, তার মহিলা ভাগ্য ভাল নয়, প্রথমবার বিয়ে করেছিল চন্দনাকে। পেটে বাচ্চা সমেত। দ্বিতীয়বার যাকে আনছে তারও বড় বড় ছেলেমেয়ে, স্বামী, সংসার সব থেকে ছিঁড়ে আনতে হবে। কোনোবারই তার সহজ সরল বিয়ে হল না। যেন চুপি চুপি পাপ কাজ সারছে।

রবি বলল--হ্যালো।

—বলো।

—আমরা কাল যাবোনা।

—আচ্ছা।

—রবিবারে যাবো।

দেবাশিস হেসে বলে—রবিবারে আমিই যাবো।

—তাহলে?

—তাহলে কি রবি?

—আমি আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবো কবে?

—আসবে। বেড়াতে আসবে কেন, এ তো তোমার নিজেরই ফ্ল্যাট। যখন খুশী আসতে পারবে। তবে এ সপ্তাহে নয়।

—কাল তাহলে আমরা ট্যাক্সিতে করে দক্ষিণেশ্বরে যাবো।

—যেও।

—ছাড়ছি বাবা। গুডনাইট।

—নাইট।

ফোন রেখে দিল দেবাশিস। ভ্রু কোঁচকালো, মুখটায় চিন্তার রেখা। অন্ধকার ঘরে, পাশের ঘর থেকে আলো এসে লম্বা হয়ে পড়েছে। সেই আলো পিছনে নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তৃণা।

দেবাশিস অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। যন্ত্রণাটা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না।

বলল—রেডি তৃণা ?

—হুঁ। কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই।

—কি হয়েছে ?

—কি করে বলব ! আজ বড্ড টায়ার্ড।

· গাড়িতে তো বসেই থাকবে। খোলা হাওয়ায় দেখো, ভাল লাগবে।

—তোমার ফ্ল্যাটে খোলা বাতাসের অভাব নেই।

—না না। ·চলো, প্লীজ। এই ফ্ল্যাটটায় আমার একদম ভাল লাগে না।

—কেন, বেশ সুন্দর তো ?

—কি জানি কেন। বেশীক্ষণ ভাসো লাগে না।

তৃণা একটু হাসির শব্দ করে বলে—আমারও কি খারাপ লাগবে দেব ?

—না। তোমার লাগবে না। আমার তো কতগুলো রিফ্লেক্স আছে। সবই তো তুমি জানো। দেয়ার আর বিটার মেমোরিজ, লোনলিনেস···সব মিলিয়ে একটা সাফোকেসনের মতো হয় মাঝে মাঝে। রবিটারও হত।

—রবি ফোনে তোমাকে ভূতের কথা কী বলছিল দেব ?

—ছেলেমানুষ তো। কে যেন ভয় দেখিয়েছে, ওর মা নাকি ভূত হয়ে আছে এখানে।

তৃণা একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল—যখন দুপুরের পরে ফোন করেছিল তখন রবি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে ? মা ?

—তুমি কি বললে ?

—কি বলব ! মিথ্যে করে বললাম রং নাম্বার।

—ঠিকই করেছো।

—ও কি ভেবেছিল ওর মায়ের ভূত কথা বলছে ?

শব্দ করে হাসল দেবাশিস। বলল—হ্যাঁ। আচ্ছা পাগল আমার ছেলেটা।

—শোনো।

– কি ?

– আর একটু পরে বেরোও। আমি একটু বসি। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম্ করে উঠল।

দেবাশিস এগিয়ে তৃণার হাত ধরে এনে সোফায় বসায় যত্ন করে। নিজে তার পাশে বসে। হাতখানা ধরে থেকে বলে – তোমার নাড়ি বেশ দুর্বল।

তৃণা ঘাড় এলিয়ে রেখে বলল – আজকের দিনটা কেমন যেন ভাল নয়। বিশ্রী দিন।

উদ্বেগে দেবাশিস ঝুঁকে বলে—কেন তৃণা ?

দেবাশিসের কাছে আসা মুখখানা হাত তুলে আটকায় তৃণা। বলে—এক একটা দিন আসে সকাল থেকেই কেবল সব কাজে ভুল হতে থাকে। যেন ভূতে পায় মানুষটাকে।

—কিরকম ?

—দেখনা, কোনো দিনই তো আজকাল রেবার বা মন্নুর ঘরে যাই না ! আজ যেন ভূতে পেল। গেলাম। রেবা হঠাৎ এসে পড়ল, চোরের মতো ধরা পড়ে গেলাম, কি বিশ্রী রকমের ব্যবহার যে করল ও।

—তুমি রেবাকে বড্ড ভালবাসো তৃণা।

—ভীষণ ভালবাসি। সেইজন্যই তো ও আমার বুক ভেঙে দেয়।

—সাতটা কিন্তু বেজে গেছে তৃণা।

—দাঁড়াও না। আজ কি একটা সাধারণ দিন! সকাল থেকেই সব অনিয়ম চলছে। অদ্ভুত দিনটা আজ। ঘড়ি টড়ি দেখোনা।

—দেখব না। বলো।

—তারপর মন্নু। ওকে বলেছিলাম, ঘরে পৌঁছে দে, শরীরটা ভাল না। তো ছেলে আমাকে জাপটে কোলে তুলে নিল। এমনিতে কথাও বলে না। তবে কেন আজ...? তারপর শচীনবাবু। সেও আজ অন্যরকম। রুমাল কুড়িয়ে দিল... অনেক কথা বলল···

—শোনো তৃণা, শচীনকে ফোনটা কিন্তু করা হয়নি।

—পরে কোরো।

—এতক্ষনে নিশ্চয়ই ওরা তোমার খোঁজ করছে। ওদের কেন অযথা ভাবতে দিচ্ছ?

—ভাবুক। একটু ভাবুক। কোনোদিন তো ভাবে না।

—না তৃণা। তুমি ভুল করছ। যা করছ তা আরো বলিষ্ঠভাবে করো। চুরি তো করোনি।

তৃণা দেবাশিসের হাতটা ধরে বলল—আঃ! তোমার কেবল ভয়। শোনোনা।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলল—বলো।

—ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে আজ ভূতে পেল।

—সে কি রকম?

—ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। ঠিক যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো। একটা ছেলে মোটরসাইকেল চালিয়ে গেল, সেই শব্দে চেতনা হয়। তারপরও ফের ভুল। একটা ট্যাক্সিওলা নিয়ে গেল দেশপ্রিয় পার্কে। তাকে ডিরেকশন দিতে মনে ছিল না, রাস্তাটাও খেয়াল করিনি। তাই মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা খুব অদ্ভুত।

—কী বলতে চাও তৃণা?

তৃণা অন্ধকারেই মুখ ফেরাল তার দিকে। বলল—এক একটা দিন আসে। ভুল দিয়ে শুরু হয়। ভুলে শেষ হয়। ভূতুড়ে দিন।

—না তৃণা, ভুল দিয়ে শেষ হচ্ছে না। তুমি বড্ড সেকেলে।

—না দেব। শোনো, আমি শুধু একটাই ঠিক কাজ করেছি আজ।

—কি ?

—শচীনকে বলে আসিনি।

—বলে আসা উচিত ছিল। এটাই ভুল করেছো।

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—না। বলে আসলেই ভুল করতাম।

দেবাশিস অধৈর্যের গলায় বলে—আমি এক্ষুনি ফের শচীনকে ফোন করছি।

বলেই বাধা না মেনে উঠে গেল দেবাশিস। ফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে করে আস্তে আস্তে ডায়াল ঘোরাতে থাকে।

ফোনটা কানে তুলে অপেক্ষা করছে। তৃণা উঠে এল কাছে। ফোনটা নিয়ে নিল হাত থেকে। রেখে দিতে যাচ্ছিল, শুনল ওপাশ থেকে একটা মেযেব গলার স্বর বলে উঠল—হ্যালো।

রেবা বোধ হয়। তৃণা তাই ফোনটা কানে লাগায়।

ওপাশে চঞ্চল ও ধৈর্যহীন গলায় রেবা বলছে—কে ? হ্যালো! কে ?

উত্তর দিতে সাহস হলনা তৃণার। কেবল খানিকক্ষণ শুনল।

রেবা চেঁচিয়ে তার বাবাকে ডাকছে—বাপি, দেখ, ফোনটা বাজল, কেউ সাড়া দিচ্ছে না এখন।

পরমূহূর্তেই শচীনের গলা—হ্যালো।

তৃণা মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রাখল।

শচীন রেবাকে ডেকে বলল—গোস্ট কল। আজকাল টেলিফোনে যত গোলমাল।

বলেই আবার, শেষবারের মতো বলল—হ্যালো। কে ?

কেউ না। আমি কেউ না। একথা মনে মনে বলে তৃণা।

দেবাশিস কানের কাছে মুখ নামিয়ে নরম গলায় বলে—তৃণা, বলতে পারলে না ?

শচীন ফোন রেখে দিল।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—না। আজকের দিনটা থাক। দিনটা ভাল নয় দেব।

—খুব ভাল দিন তৃণা।

—না দেব, আজ কোনো ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না।

—তাহলে কি করবে তৃণা ?

—তাহলে···

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে।

দেবাশিস অপেক্ষা করে উগ্র আগ্রহে।

॥ আট ॥

গাড়ি থামল। গাড়ি চলে গেল।

নিজের বাড়ির সামনে একা দাঁড়িয়ে তৃণা। বুকে একটা খাঁ খাঁ আকাশ। সেই আকাশে নানা ভয়ের শকুন উড়ছে।

রাত আটটা বেজে গেছে। তবু তেমন রাত হয়নি। এখনো স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঢোকা যায়। কেউ ফিরেও তাকাবে না সে জন্য। দেবাশিসের গাড়িটা গড়িয়াহাটা রোডের মুখে গিয়ে বাঁ ধারে মোড় নিল।

তৃণা বাড়ির গেট দিয়ে ধীর পায়ে ঢোকে। মস্ত আলো জ্বলছে বাইরে। ছোট বাগানটার গাছপালার ওপর আলো পড়েছে। হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠেছে। ফুলের গন্ধ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে বাতাস।

আজকের দিনটা দেবাশিসের কাছে ভিক্ষে নিল তৃণা। আজ দিনটা ভাল নয়। এই ভূতুড়ে দিনে এতবড় একটা সাহসের কাজ

করতে তার ইচ্ছে করল না। আজকের দিনটা কেটে গেলে এরপর যে কোনোদিন সে চলে যাবে। কেন থাকবে এখানে? কেন থাকবে!

আস্তে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বাঁ ধারের ঘরটায় টেবিল-টেনিস খেলছে রেবা আর তার এক মাদ্রাজী মেয়ে-বন্ধু সরস্বতী। ছোটাছুটি করছে। হাসছে। তাকে কেউ দেখল না।

শচীনের কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে বলল—চোর এসেছে। চোর এসেছে। শচীন! শচীন!

তৃণা ধীরে তার ঘরে এসে দাঁড়ায়। আলো জ্বালে না। চুপ করে বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ, এবং বসে থাকতে থাকতেই টের পায়, বুকে আকাশ, আকাশে শকুন।

মনটা ভাল থাকলে এই নিয়ে একটা কবিতা লিখত সে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃণা। অলক্ষ্যে এবং নিজেরও অজান্তে চাকর এসে ডাকল – মা, খাবেন না? সবাই বসে আছে।

তৃণা উঠল। চাকরের মুখের মা ডাকটা কানে বাজতে থাকে। বাথরুম সেরে এসে খাওয়ার টেবিলে চলে গেল সে। রাতের খাওয়ার সময়টায় সে প্রায়ই থাকে। নিয়ম। না থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু নিয়ম।

খাওয়ার টেবিলে আজ সবাই খুব হাসি খুশী।

শচীন ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলছে। কথামৃতের গল্প। সবাই শুনছে। এসব গল্পের মধ্যে অবশ্য তৃণাকে ওরা রাখেনা। টেবিলের একধারে তৃণা চুপ করে বসে থাকে। টেবিলে সাজানো খাবার। যে যার ইচ্ছেমতো প্লেটে তুলে নিয়ে খায়।

শচীন গল্পের শেষে বলল—জাপানের চালানটা এলে দেখবি। বামন গাছের এমন একটা বাগান করব।

—আমাদের স্কুলে ইকেবানা শেখায়। রেবা বলে।

মন্টু বলল – সে আবার কি?

—ফুলদানী সাজানো। খুব মজার। জাপানীরা স্বর্গ, মানুষ আর পৃথিবী এই প্যাটার্নে ফুল সাজায়! অদ্ভুত।

মনু বলে—জাপানীরা খুব প্রগ্রেসিভ। না বাবা?

—প্রগ্রেসিভ! শচীন বলে—তাছাড়া ওদের মতো মাথা কারো নেই। শুধু দোষের মধ্যে বড্ড সেন্টিমেন্টাল, একটুতেই সুইসাইড করে।

—হারিকিরি। রেবা বলে।

—হারিকিরি নয়। মনু বলে—হারাকিরি।

এইরকম সব কথা।

রান্নার লোকটা নিঃশব্দে ঘরের একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রোজই থাকে। চমৎকার রাঁধে সে। কোনো ভুল হয় না।

আজ হঠাৎ চাইনীজ চপ সুয়ের একচামচ মুখে তুলেই রেবা চেঁচিয়ে বলে—চিত্ত, আজ এটাতে নুন দাওনি!

চিত্ত শশব্যস্তে এগিয়ে আসে—দিয়েছিলাম তো!

—দাওনি। রেবা জোরের গলায় বলে।

মনু একটু মুখে দিয়ে বলে—দিয়েছে। তবে কম হয়েছে।

শচীন বলল—টেস্ট কিন্তু দারুণ।

রেবা বিরক্ত হয়ে তার বাবার দিকে নুনের কৌটো এগিয়ে দেয়। কী ভেবে নিজেই নুন ছড়িয়ে দেয়। মনুর প্লেটেও দেয়।

তারপরই হঠাৎ তৃণার দিকে ফিরে বলে—মা, তোমাকে…ওঃ, তুমি তো এখনো খাওয়া শুরুই করোনি।

তৃণা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে, রেবা তাকে মা বলে ডাকছে। গত একবছর একবারও ডাকেনি। তার কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। বুক ভেসে যায়, হৃদয় ক্ষরিত হয়। বহুকাল বাদে স্তনের ভিতরে যেন ঠেলে আসে দুধ। অস্থির তৃণা চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ সে বুঝি জীবনে একবারও আর ভোগ করেনি।

কেউ তার অবস্থা লক্ষ্য করছে না। ভাগ্যিস! শচীন ওদের বিদেশের একটা অভিজ্ঞতার গল্প করছে। ওরা কি জানে তৃণার ভিতরে একটা ট্যাপ কে যেন খুলে দিয়েছে! অবিরল নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে তার শরীর দিয়ে। সেই স্রোত তার চারধারে সব কিছুকেই অবগাহন করাচ্ছে, শব্দটা কান পেতে শোনে তৃণা। স্রোতের শব্দ।

পরদিন সকালে তৃণা কবিতার খাতা নিয়ে বসল।

আজও দেবাশিস আসবে। বিকেলবেলায়। বাসস্টপে।

॥ নয় ॥

সারা বাড়িতে আজ চন্দনার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেবাশিস একা সিগারেট খেল অনেকক্ষণ। আবার উঠল। জানালাটা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ওপর। বহু নীচে ফুটপাথ। মাঝখানে নিরাবলম্ব শূন্যতা। চন্দনা কি করে অত সাহস পেল?

দেবাশিস তো পারে না। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। ঘর সাজাবে বলে, ফুলশয্যা বলে ফুল এনেছিল সে। এখন এই তরাতে সেই ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। কী গভীর সুগন্ধ! সুগন্ধটা টেনে রাখে তাকে।

দেবাশিস প্রেতের মতো একা এসে বসে সোফায়। মাথার চুল মুঠো করে ধরে। রবি নেই। রবি এখন মণিমার বুক ঘেঁসে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

একবার রবির ঘরে এল দেবাশিস। রোজ রাতেই আসে। ছোট ছোট শ্বাস ফেলে রবি ঘুমোয়। চেয়ে দেখে। পাশ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আজ রবির ছোট্ট বিছানাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

আজকের দিনটা ভাল নয়। তৃণা বলেছিল। সত্যিই। আজকের দিনটা কেমন যেন! হাতের মুঠো থেকে পয়সা হারিয়ে গেলে শিশু যেমন অবাক তেমনি লাগছিল দেবাশিসের।

রবি নেই। তৃণা নেই।

ভালই। এ একরকমের ভালই।

প্রেতের মতো ভয়ঙ্কর শুকনো একটা হাসি হাসল দেবাশিস।

বুকে এখনো যেন রবির খেলনা পিস্তলের মিথ্যে গুলি বিঁধে আছে। বড় যন্ত্রণা।

অস্ফুট শব্দ করল দেবাশিস। যন্ত্রণাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

কালই ইনডেক-এর একটা মস্ত কণ্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে আসানসোলে। সকালের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।

দেবাশিস শুল। ঘুম আসছে ভারী ক্লান্তির মতো। ঘুমচোখে মনে পড়ল, ভুল করে কাল বিকেলে বাসস্টপে আসতে বলেছে তৃণাকে। এসে ফিরে যাবে।

ফোন করবে? থাকগে। আজ একটা ভুলের দিন গেল। আজ আর ভুলগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করবে না। থাক। ভুলের দিনটা কেটে যাক।

—*—